Contents

তাওহীদের ডাক

মার্চ-এপ্রিল ২০১৫

- ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৮
- দাওয়াতের গুরুত্ব ও মূলনীতি
- সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- ইখলাছ অর্জনের উপায়
- সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার মৌলিক কর্তব্য
- আরাফার খুৎবা
- আযানের মধুর ধ্বনিতে ইসলামের ছায়াতলে এক ইহূদী নারী

প্রসঙ্গ : হলুদ সাংবাদিকতা ও ইহূদীদের বিশ্ব মিডিয়া কব্জা

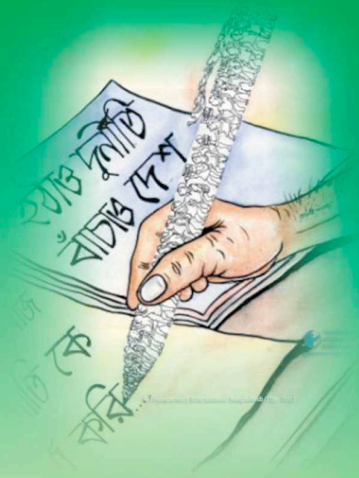

Contents

لااله الا الله
محمد رسول الله

The Call to Tawheed

তাওহীদের ডাক

২২তম সংখ্যা

মার্চ-এপ্রিল ২০১৫

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
মুযাফফর বিন মুহসিন
নূরুল ইসলাম
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহিল কাফী

সহকারী সম্পাদক
বযলুর রহমান

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সহকারী সম্পাদক : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯ (বিকাশ)
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www. tawheederdak.at-tahreek.com

মূল্য : ২০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও ইমাম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

⇨ সম্পাদকীয় ২

⇨ কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা ৩

⇨ আক্বীদা ৫
ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৮
মুযাফফর বিন মুহসিন

⇨ তাবলীগ ৯
দাওয়াতের গুরুত্ব ও মূলনীতি
আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

⇨ তানযীম ১৫
সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
বযলুর রহমান

⇨ তারবিয়াত ২০
ইখলাছ অর্জনের উপায়
আব্দুল গাফফার বিন আব্দুর রাযযাক

⇨ ধর্ম ও সমাজ ২৬
সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার মৌলিক কর্তব্য
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

⇨ চিন্তাধারা ৩১
প্রসঙ্গ : হলুদ সাংবাদিকতা ও ইহূদীদের বিশ্ব মিডিয়া কব্জা
মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

⇨ আহলেহাদীছ আন্দোলন ৩৬
দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

⇨ পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে ৩৮
আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ
তাওহীদের ডাক ডেস্ক

⇨ পরশ পাথর ৪১
আযানের মধুর ধ্বনিতে ইসলামের ছায়াতলে এক ইহূদী নারী
তাওহীদের ডাক ডেস্ক

⇨ তারুণ্যের ভাবন
(ক) হৃদয়ের রক্তক্ষরণ : চাই বিশ্বাসের সংশোধন ৪৩
এস এম তারিক হাসান
(খ) বাঙালি কেন পাঠক নয় ৪৫
মেহেদী আরীফ

⇨ ভ্রমণস্মৃতি ৪৭
সাফা হাফং-এর পথে
আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

⇨ আলোকপাত ৫০

⇨ কবিতা ৫৩

⇨ সংগঠন সংবাদ ৫৪

⇨ আইকিউ ৫৬

সম্পাদকীয়

ক্ষমতার অভিলাষ ও দুর্নীতির অভিশাপ : বাংলাদেশের সর্বনাশ

অসৎ নেতৃত্ব ও অবৈধ অর্থ মানুষকে নির্বোধ ও অন্ধ করে দেয়। অবশেষে পশুত্বের নিম্ন পর্যায়ে নিয়ে যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের এই অন্যতম দু'টি অবকাঠামো যদি ভঙ্গুর হয়ে যায়, তবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও অর্থনীতি সর্বত্র ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়ে। ফলে পুরো দেশ ও জাতির সর্বনাশ হয়ে যায়।

আইন সভা, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ দেশের এই তিনটি মূল কাঠামোতে যিনি যে পর্যায়ে আছেন, তিনি সেখান থেকে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন ইচ্ছামত। কিছু ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি থাকলেও তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না। কারণ তাদেরকে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয় না। ফলে তারা আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে পারেন না। এই সুযোগে একশ্রেণীর রক্তপিপাসু কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল হত্যা, গুম, খুন, অপহরণ, যুলুম ও নিপীড়নে মেতে উঠেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বিরোধীদের উপর চালায় নির্যাতনের স্টীম রোলার। অন্যদিকে প্রশাসনের দু'টি বিভাগ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সিভিল প্রশাসন উভয়ই আইন ও ক্ষমতার জোরে নিরীহ মানুষের উপর অভিনব কায়দায় নৈরাজ্য চালায়। মিথ্যা মামলা দেওয়া, গ্রেফতার করা, পুঙ্গ করা, মানসিক রোগী বানানো, অবশেষে কথিত ক্রসফায়ার বা বন্দুক যুদ্ধের নামে বিলীন করে দেয়া এখন যেন আইন হয়ে গেছে। সিভিল প্রশাসনের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল ব্যক্তি পদের দাপটে যা ইচ্ছা তা-ই করছেন। কাকে কোন্ অপরাধে কিভাবে ফাঁসানো হবে, সেই কৌশল নিয়েই তারা ব্যস্ত। এদিকে বিরোধরীরা প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছে হরতাল, অবরোধ, পেট্রোলবোমা, ককটেল, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মত জঘন্য কর্মকাণ্ড।

বিচার বিভাগের কথা বলে লাভ কী? অধিকার বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষটি যখন সর্বশেষ আশ্রয় হিসাবে বিচার বিভাগের দ্বারে যান, তখন তিনি বিচারের নামে নির্মম প্রহসনের অসহায় শিকার হন। বিচার বিভাগ নিকট অতীতে 'স্বাধীন' হলেও অনেকটাই সরকারের অদৃশ্য ইশারার বিভৎস শিকার। এভাবেই বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। দায়িত্ব জ্ঞানহীন, অসৎ, লোভী, নরখাদকরা রাষ্ট্রীয় যন্ত্রে বসে থাকার কারণে দেশ ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে।

এই অপরাধী চক্র দুনিয়াবী প্রায়শ্চিত্ত থেকে রক্ষা পেলেও পরকালীন শাস্তি থেকে কখনোই রেহাই পাবে না। বিচারের মাঠে এদের অবস্থা খুবই করুণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। অন্যত্র বলেন, 'যার উপর আল্লাহ কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন, আর যদি সে তা সুষ্ঠুভাবে পালন করে না, তবে সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৮৭)*। অন্য হাদীছে এসেছে, প্রশাসনের কোন লোক যদি কোন নিরীহ মানুষের শরীরে আঘাত, তবে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত হবে *(মুসলিম হা/৫৭০৪)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিমদের দায়িত্ব গ্রহণের পর যদি কোন ব্যক্তি তার খিয়ানত করে মারা যায়, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৮৬)*। অন্যত্র এসেছে, ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের কোমরে একটা করে পতাকা গুঁজে দেয়া হবে, যা তার আত্মসাতের সমপরিমাণ হবে। মনে রেখ, সেদিন বড় ঝাণ্ডা হবে রাষ্ট্রপ্রধানের' *(মুসলিম হা/১৭৩৮; মিশকাত হা/৩৭২৭)*।

অনুরূপ দুর্নীতি, আত্মসাৎ, সূদ-ঘুষ, জুয়া-লটারী, মওজুদদারী ও মুনাফাখোরীর অভিশাপে দেশ পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের কর্তারা প্রত্যেকেই এ সমস্ত অপকর্মের সাথে জড়িত। এই অপবিত্র অর্থ স্ত্রী-সন্তানের উপর ব্যয় করার কারণে নিজ পরিবারকে গলিত নর্দমায় পরিণত করেছে। তাদের অস্থি-মজ্জায় হারামের বিস্তার হওয়ায় বংশের শিকড়ে এই মরণ ক্যান্সার মিশ্রিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সৎ হওয়ার কোন সম্ভবনাই নেই। তাছাড়া এ ধরনের অবৈধ অর্থ উপার্জন করে কেউ সুখী হয় না। লোভের তাড়নায় হঠাৎ মহা বিপদের সম্মুখীন হয়। আর পরকালের শাস্তি তো আছেই। প্রথমতঃ জীবনে যা কিছু আত্মসাৎ করেছে, সবই বহন করে ক্বিয়ামতের মাঠে হাযির হবে এবং বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত মাথায় নিয়ে থাকবে। জনগণ দেখবে, গোপন করার কোন সুযোগ থাকবে না। আল্লাহ বলেন, যে যা আত্মসাৎ করবে, সে তাই নিয়ে ক্বিয়ামতের দিন হাযির হবে' *(আলে ইমরান ১৬১)* ওমর (রাঃ) বলেন, 'খায়বারের যুদ্ধের পর ছাহাবীগণ বললেন, অমুক অমুক শহীদ। শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকে শহীদ বললেন, যার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কখনোই না। আমি তাকে জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছি। কারণ সে একটি চাদর আত্মসাৎ করেছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৩৪)*। এ কথা শুনে কেউ একটি জুতার ফিতা বা দু'টি ফিতা জমা দিলে রাসূল (ছাঃ) বললেন, একটি বা দু'টি ফিতাও জাহান্নামে যাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৯৯৭)*। তাই কোন ক্ষুদ্র বস্তুও কেউ যদি আত্মসাৎ করে, তবে তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত কোন শরীর জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(আহমাদ, মিশকাত/২৭৮৭)*। তিনি অন্যত্র বলেন, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন করবে, ক্বিয়ামতের দিন সে জাহান্নাম যাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৯৯৫)*।

দেশের এই দুর্গতি থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন নৈতিক উন্নয়ন ও মানবিক দায়বদ্ধতা। বল প্রয়োগ, দাপট, আইন, শাসন ও অস্ত্র কখনো স্থায়ী সমাধান করতে পারবে না। তাই আমাদেরকে সেই আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান করতে হবে। একমাত্র আল্লাহভীতি ও পরকালের কঠিন জবাবদিহিতাই সেই শান্তির পথের সন্ধান দিতে পারে। আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন-আমীন!!

ছিরাতে মুস্তাক্বীম

আল-কুরআনুল কারীম :

১- سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

(১) 'নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে, তারা এ যাবৎ যে ক্বিবলা অনুসরণ করে আসছিল তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল? বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন' *(বাক্বারাহ ২/১৪২)*।

২- إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ.

(২) 'নিশ্চয় আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করবে। এটাই সরল পথ' *(আলে ইমরান ৩/৫১)*।

৩- يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا- فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.

(৩) 'হে মানুষ সকল! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি। যারা আল্লাহতে ঈমান আনে ও তাঁকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি অবশ্যই তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে দাখিল করবেন এবং তাদেরকে সরল পথে তাঁর দিকে পরিচালিত করবেন' *(নিসা ৪/১৭৪-১৭৫)*।

৪- وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

(৪) 'এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা ইহারই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা সাবধান হও' *(আন'আম ৬/১৫৩)*।

৫- قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ- ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

(৫) 'সে বলল, তুমি আমাকে শাস্তিদান করলে, এজন্যে আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওঁত পেতে থাকব। অতঃপর আমি তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হতে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না' *(আ'রাফ ৭/১৬-১৭)*।

৬- إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

(৬) 'আমি ভরসা করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে' *(হূদ ১১/৫৬)*।

৭- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

(৭) 'ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত, আল্লাহ্র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিল আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে' *(নাহল ১৬/১২০-১২১)*।

৮- وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

(৮) 'মেপে দেবার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং ওযন করবে সঠিক ভাবে দাঁড়িপাল্লায়, ইহা উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৫)*।

৯- لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ.

(৯) 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি ইবাদত পদ্ধতি, যা তারা অনুসরণ করে। সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে বিতর্ক না করে এই ব্যাপারে। তুমি তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, তুমি তো সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত' *(হজ্জ ২২/৬৭)*।

১০- أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

(১০) ' যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সেই কি ঠিক পথে চলে, না-কি সেই ব্যক্তি, যে ঋজু হয়ে সরল পথে চলে?' *(মুলক ৬৭/২২)*।

হাদীছে নববী থেকে :

১১- عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.

(১১) ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা দৃঢ় থাক এবং কখনো গণনা করা না। জেনে রাখ! তোমাদের সর্বোত্তম আমল হল ছালাত। মুমিনদের ওযূ ছাড়া যা সংরক্ষণ হয় না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৭৭; মিশকাত হা/২৯২, সনদ ছহীহ)*।

১২- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِى فِى الإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ.

(১২) সুফিয়ান ইবনু আব্দুল্লাহ আছ-ছাক্বাফী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন

কথা বলেন যাতে করে আমাকে আপনার পরে অন্য কারো নিকট জিজ্ঞেস করতে না হয়। তিনি বললেন, তুমি বল, আমি আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তার উপর দৃঢ় থাক *(মুসলিম হা/১৬৮)*।

١٣- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللّٰهُ وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ.

(১৩) মু'আবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেন। আর আমি বণ্টনকারীমাত্র, যা আল্লাহ দান করে থাকেন। এ উম্মতের কার্যকলাপ ক্বিয়ামত অবধি কিংবা বলেছেন, মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুম আসা পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে *(বুখারী হা/৭৩১২)*।

١٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

(১৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় দ্বীন সহজ। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ী করে তার উপর দ্বীন জয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর এবং এর নিকটে থাক। আশান্বিত থাক এবং সকালে ও সন্ধ্যায় এবং রাতের কিছু অংশ সাহায্য চাও *(বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬)*।

١٥- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(১৫) আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, আমাকে এমন আমল সম্পর্কে বলেন, যে আমল আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করায় এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে। তখন তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্র ইবাদত করবে কোন কিছুকে তার সাথে শিরক করা ব্যতীত, ছালাত ক্বায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবে। অতঃপর লোকটি যখন চলে গেল তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নির্দেশিত বিষয়ের উপর যদি সে দৃঢ় থাকে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(বুখারী হা/১১৫)*।

١٦- عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي وَاذْكُرْ بِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْمِ.

(১৬) আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, বল! হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেদায়াত দান করুন, সোজা পথে পরিচালিত করুন। তুমি তোমার হেদায়াত ও সঠিক পথ সোজা তীরের মত স্মরণ কর *(মুসলিম হা/৭০৮৬)*।

١٧- عَنْ أَبِيْ فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهَا.

(১৭) আবু ক্বাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন বিষয়ের কথা বলুন, যার প্রতি আমি অটল থাকব এবং আমল করব। তিনি বললেন, তুমি হিজরত কর। কারণ এর বিকল্প কিছু নেই *(নাসাঈ হা/৪১৬৭, সনদ ছহীহ)*।

١٨- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ اعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ إِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي قَالَ اسْتَقِمْ وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ.

(১৮) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, কোন একদিন মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) সফরের ইচ্ছা করলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে অছিয়ত করুন। তিনি বললেন, আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তার সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করবে না। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আরো কিছু বলেন। তিনি বললেন, যখন *(ছহীহ তারগীব হা/৩১৫৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২২৮, সনদ হাসান)*।

মনীষীদের বক্তব্য থেকে :

১. আবুবকর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'দৃঢ় থাকা' অর্থ কি? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। এখানে মূলতঃ নির্ভেজাল তাওহীদের উপর দৃঢ় থাকাকেই বুঝানো হয়েছে।

২. ওমর ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, নির্দেশিত বিষয়ের উপর এবং নিষেধকৃত বস্তু থেকে বিরত থাকার উপর দৃঢ় থাকাকে 'ইস্তিকামা' বলে।

৩. ওছমান (রাঃ) বলেন, ছিরাতে মুস্তাক্বীম অর্থ আল্লাহ্র জন্য একনিষ্ঠচিত্তে আমল করা।

৪. আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) বলেন, ছিরাতে মুস্তাক্বী ম অর্থ ফরয সমূহ আদায়ের উপর দৃঢ় থাকা।

৫. হাসান (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নির্দেশিত বিষয়ের উপর দৃঢ় থাকা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং সীমালংঘন কাজ থেকে বিরত থাকা।

সারবস্তু

১. ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর দৃঢ় থাকা ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং দ্বীন ইসলামের সৌন্দর্য।

২. ছিরাতে মুস্তাক্বীমের মাধ্যমে মানুষ উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চ আসনে আসীন হয়।

৩. এটি দ্বারা অন্তর ও শারীরিক দৃঢ়তাকে বুঝায়।

৪. অধিক নফল আমলের চেয়ে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর সর্বদা অটল থাকা অধিক উত্তম।

৫. ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথিকের উপর মানুষ দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং তার সাহচর্য পসন্দ করে।

৬. ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর দৃঢ় থাকা সর্বোচ্চ সম্মানের কারণ

৭.. দৃঢ় বিশ্বাসের প্রমাণ এবং বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন।

ভ্রান্ত আক্বীদা : পর্ব-৮

মুযাফফর বিন মুহসিন

(২৭) প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীসহ বিভিন্ন দিবসকে মঙ্গলময় মনে করা :

মঙ্গল, কল্যাণ ও শুভ কামনায় বিভিন্ন দিবস ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয় মহা ধুমধামে। ১লা বৈশাখে 'মঙ্গল শোভা যাত্রা' বের করা ও ইলিশ মাছ দিয়ে পান্তা ভাত খাওয়ার উদ্দেশ্য হল, বৈশাখ জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে। শুভ নববর্ষ, নববর্ষের শুভেচ্ছা, নববর্ষ উদ্‌যাপন ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা হয় মঙ্গলের বার্তাবাহক হিসাবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস, বালাকোট দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস যেভাবে পালন করা হয়, তাতে মূলতঃ দিবসের কৃতিত্বই স্মরণ করা হয়। এই দিনগুলোতে আয়োজন করা হয় দু'আ মাহফিল, মীলাদ মাহফিল ও মিসকীন খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। এছাড়া ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ইট-বালি-সিমেন্ট দ্বারা তৈরি শহীদ মিনার ও বেদীতে। ইসলামী দলের নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন বার্ষিকীতে শববেদারী পালন করেন অর্থাৎ ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করেন। দলের পক্ষ থেকে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয় এবং অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথে গুরু গম্ভীরভাবে দিবসটাকে মর্যাদা দান করা হয়।

পর্যালোচনা : দিবস বা প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের ক্ষেত্রে সাধারণত দু'টি দিক লক্ষ্য করা যায়। এক- দিনটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং কল্যাণবহ মনে করা হয়। সেই সাথে এমন কিছু কর্মসূচী পালন করা হয়, যেগুলো পরিষ্কার শিরক। এভাবে এগুলো শিরকের আওতায় পড়ে যায়। দুই- কিছু কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক কুসংস্কার হিসাবে তা পালন করা হয়, যার অধিকাংশই বিধর্মীদের আবিষ্কার করা। এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে বিদ'আত এবং অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। মূলতঃ এ সমস্ত অপসংস্কৃতিকে ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ-

(ক) ইসলামে দিবস পালনের কোন প্রমান নেই, অনুমোদনও নেই। অথচ পালন করার মত অনেক কিছুই রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবস পালন করেননি, যদিও কিছু বিদ'আতী গোষ্ঠী বর্তমানে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে দিবস পালন করে থাকে। এছাড়া নবুঅত দিবস- যেদিন প্রথম অহি নাযিল হয়েছে। হিজরত দিবস, মক্কা বিজয় দিবস, বদর দিবস, ওহুদের যুদ্ধে হামযাহ (রাঃ) সহ অনেকেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন মর্মে 'শহীদ দিবস' পালনের কোন নযীর নেই। ওমর, উছমান ও আলী (রাঃ)-এর শাহাদাত উপলক্ষে 'শাহাদাত দিবস' পালন করা ও কোন প্রতিকৃতি, মিনার নির্মাণ করারও কোন প্রমাণ সোনালী যুগের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বরং এগুলোর বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান। যেমন শুক্রবার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। কিন্তু এই দিনে বিশেষ কোন ইবাদত করা বা ছিয়াম পালন করার জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ।[১] এছাড়া কোন স্থান তো দূরের কথা, বিশেষ নেকীর আশায় তিনটি মসজিদ ছাড়া কোন মসজিদেও ভ্রমণ করা যাবে না।[২]

জ্ঞাতব্য :

শরী'আতে কয়েকটি দিনের ব্যাপারে গুরুতারোপ করা হয়েছে। তবে যেগুলো ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, হজ্জের দিনগুলো, ৯ ও ১০ ই মহররম ছিয়াম পালন করা ইত্যাদি। এই দিনগুলোতে কোন মানুষকে স্মরণ করা হয় না, কোন খাম্বা, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য বা কোন বেদীর পূজা করা হয় না। তাছাড়া এগুলো শরী'আত কর্তৃক স্বীকৃত। তাই কোন প্রশ্ন নেই।

(খ) কোন স্তম্ভ, খাম্বা, প্রতিকৃতি ও জড়বস্তুকে শ্রদ্ধা জানানো, সেখানে নীরবতা পালন করা, কল্যাণ কমনা করা সবই মূর্তিপূজার শামিল। যেমন বিধর্মীরা হাত, পা, মাথা, চোখ, কান, দেহ সম্পন্ন প্রতিকৃতি নির্মাণ করে তার পূজা করে। ইসলামে এটা 'শিরকে আকবার' বা বড় শিরক। এটা প্রাচীন শিরক। নূহ (আঃ)-এর সময় থেকেই এটা নিষিদ্ধ। তিনি যখন তাঁর উম্মতকে প্রতিকৃতি পূজা বর্জন করতে বললেন, তখন তাদের নেতারা জনগণকে বলল, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا 'তোমরা কখনো তোমাদের মা'বূদগুলোকে বর্জন কর না এবং ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়াঊক ও নাসরকেও বর্জন কর না' *(নূহ ২৩)*। মূলতঃ এগুলো সৎ ব্যক্তিদের নাম। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِيْنَ مِنْ قَوْمِ نُوْحٍ فَلَمَّا هَلَكُوْا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنِ انْصِبُوْا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا يَجْلِسُوْنَ أَنْصَابًا وَسَمُّوْهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوْا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ.

'এগুলো নূহ (আঃ)-এর কওমের সৎ ব্যক্তিদের নাম। যখন তারা মারা গেলেন, তখন শয়তান তাদেরকে ঐ ব্যক্তিদের বসার স্থানগুলোতে তাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করার পরামর্শ দিল। ফলে তারা তাদের নামসহ ভাস্কর্য নির্মাণ করল। কিন্তু তখন এগুলোর ইবাদত করা হত না। যখন ঐ লোকেরা মারা গেল এবং এর ইতিহাস ভুলে গেল, তখন পরবর্তী লোকেরা এগুলোর ইবাদত করা শুরু করল'।[৩]

উক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, প্রতিকৃতি পূজা মূলত: শয়তান আবিষ্কার করেছে। এছাড়া ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় স্তম্ভ পূজা করতে থাকলে তিনি তার প্রতিবাদ করে বলেন, তোমরা এই প্রতিকৃতির সামনে কেন নীরবে দাঁড়িয়ে থাক? উত্তরে তারা বলেছিল, পূর্বপুরুষরা করত তাই আমরা করি। অতঃপর তিনি

১. মুসলিম হা/২৭৪০; মিশকাত হা/২০৫১-৫২।

২. ছহীহ বুখারী হা/১১৮৯, ১/১৫৮ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১১৬, ২/৩২৭ পৃঃ); মিশকাত হা/৬৯৩, পৃঃ ৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪১, ২/২১৪ পৃঃ।

৩. ছহীহ বুখারী হা/৪৯২০, 'তাফসীর' অধ্যায়, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

সেই মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দেন *(সূরা আম্বিয়া ৫২-৫৮)*। মূসা (আঃ)-এর সময়েও কিছু লোক 'যাতু আনওয়াত্ব' বা প্রতিকৃতি তৈরি করতে বললে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। অনুরূপ রাসূল (ছাঃ)-এর সময়ও এ ধরনের কোন স্থান বা স্তম্ভ পূজা করার অনুমতি ছাহাবীরা পাননি।[৪] ওমর (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, যে গাছের নীচে রাসূল (ছাঃ) বায়'আত নিয়েছিলেন, সেখানে মানুষ বরকতের আশায় একত্রিত হচ্ছে, তখন তিনি গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন।[৫] হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে অনেক ফযীলত বর্ণিত হলেও ওমর (রাঃ) তার সম্পর্কে যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন, তা মুসলিমদের শিরক বিরোধী চেতনাকে উজ্জীবিত করে।

عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ إِنِّيْ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

আবেস বিন রাবী'আ (রাঃ) বলেন, আমি ওমর (রাঃ)-কে দেখলাম, তিনি 'কালো পাথর'-কে চম্বন করার সময় বলছেন, নিশ্চয় আমি জানি যে, তুমি কেবল পাথর মাত্র। তুমি ক্ষতিও করতে পার না, উপকারও করতে পার না। আমি যদি রাসূল (ছাঃ)-কে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম।[৬]

সুধী পাঠক! ওমর (রাঃ) যদি ফযীলতপূর্ণ উক্ত কালো পাথর সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করেন, তবে আধুনিক ভাস্কর্য, মূর্তি, মিনার ও স্তম্ভকে কিভাবে শ্রদ্ধা জানানো যায়? উপলব্ধির বিষয় হল, মানুষাকৃতির মূর্তি যদি এরূপ ঘৃণিত হয়, তাহলে শহীদ বেদী নামে হাত, পা, মাথা, চোখ, কানহীন খাম্বা পূজা কত ঘৃণিত হতে পারে? মুসলিম ব্যক্তি সেখানে কুর্নিশ করলে তার ঈমানের লেশমাত্র থাকবে কি?

(গ) এগুলো মূলত: ইহুদী-খ্রীস্টান-হিন্দু-ব্রাহ্মণ তথা বিজাতীদের সংস্কৃতি। তাই কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য তা অনুকরণীয় নয় *(মায়েদাহ-৫১১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অনুকরণ করবে, সে ঐ জাতিরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৭]

ইসলামের দৃষ্টিতে করণীয় কী?

কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গলে তার আত্মার জন্য যে কোন সময় যেকোন দিনে যেকোন মুহূর্তে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করা, মাগফিরাত কামনা করা এবং তার জন্য ছাদাক্বাহ, দান-খয়রাত করা শরী'আত অনুমোদন করেছে।[৮]

(২৮) ঈমান বাড়েও না কমেও না। অর্থাৎ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই।

ঈমান কম-বেশী হয় না বলে কিছু মানুষের মাঝে ধারণা প্রচলিত আছে। খারেজী, মু'তাযিলা ও মুরজিয়াসহ কতিপয় ভ্রান্ত দল এই আক্বীদা পোষণ করে থাকে।

পর্যালোচনা : উক্ত বিশ্বাস সঠিক নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সৎ কাজে ঈমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং অসৎ কাজে ঈমান হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ- الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ-أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ.

'তারাই মুমিন যাদের নিকটে আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে হৃদয় কম্পিত হয়। আর যখন তাদের নিকট আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করা হয়। তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভরশীল। যারা ছালাত আদায় করে এবং আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে, তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকটে রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা' *(আনফাল ২-৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيْمَانًا فَأَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ- وَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كَافِرُوْنَ.

'যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ বলে, এটা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? যারা মুমিন এটা কেবল তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে। আর তারাই আনন্দিত হন। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এটা তাদের অন্তরের কলুষের সাথে আর কলুষ বৃদ্ধি করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফের অবস্থায়' *(তওবা ১২৪-১২৫)*। এছাড়া সূরা আলে ইমরান ১৭৩, আহযাব ২২, ফাতহ ৪ প্রভৃতি আয়াতে ঈমান বৃদ্ধির বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ.

রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা রয়েছে, যার মধ্যে সর্বোত্তম হল, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হল, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা'।[৯]

ওমর (রাঃ) বলেন, পৃথিবীর সকল মুমিনের ঈমান আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমানের সাথে ওযন করা হলে, আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমানের ওযন বেশী হবে।[১০]

---

৪. তিরমিযী হা/২১৮০; মিশকাত হা/৫৪০৮, 'ফেৎনা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩; সূরা আ'রাফ ১৩৮।
৫. মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৭৫৪৫; তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ৮৩।
৬. বুখারী হা/১৫৯৭, 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫০; মিশকাত হা/২৫৮৯।
৭. আবুদাউদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭।
৮. আবুদাউদ হা/৩২২১, পৃঃ ৪৫৯; মিশকাত হা/১৩৩, পৃঃ ২৬; ছহীহ মুসলিম হা/২২৩২, ১/৩১১ পৃঃ।
৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম হা/১৬১ ও ১৬২; বুখারী হা/৯; মিশকাত হা/৫।
১০. ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল (২১৩-২৯০ হিঃ) কিতাবুস সুন্নাহ হা/৮২১।

ঈমান সম্পর্কে যাদের আক্বীদা বিভ্রান্তিকর :

ইসলামের ইতিহাসের শুরু থেকেই খারেজী, শী'আ, মুরজিয়া, মু'তাযিলা, ক্বাদারিয়া, জাহমিয়া, রাফেযী প্রভৃতি দল ঈমান সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসই সমাজে প্রচলিত আছে। প্রকৃত ঈমানের ধারণা সমাজে এখন প্রায় অনুপস্থিত। তাই সর্বদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আহলেহাদীছ বা সালাফীদের আক্বীদা পোষণ করতে হবে।[১১]

(২৯) কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তিকে কাফের মনে করা এবং হত্যাযোগ্য অপরাধী হিসাবে গণ্য করা। উক্ত অবস্থায় মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করা। এই বিশ্বাসের আলোকে গোনাহগার শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, সশস্ত্র সংগ্রাম করা ওয়াজিব বলে আক্বীদা পোষণ করা।

চরমপন্থী খারেজীরা ইসলামের নামে উক্ত আক্বীদা পোষণ করে থাকে। বরং যারা এ ধরনের শাসকের সমর্থক তাদের রক্তকেও তারা হালাল মনে করে।[১২]

পর্যালোচনা : উক্ত বিশ্বাস সঠিক নয়। কারণ কোন ব্যক্তি কাবীরা গোনাহ করলে তার ঈমান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। গোনাহের ধারা অব্যাহত থাকায় ঈমান শূন্য হলেও সে ইসলাম থেকে খারিজ হবে না। তাই সে কাফেরও নয়, হত্যাযোগ্য অপরাধীও নয়। তওবা না করে মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও নয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগের পর কালেমা ত্বাইয়েবার বদৌলতে এক সময় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাকে যেমন পূর্ণ মুমিন বলা যাবে না, তেমনি কাফেরও বলা যাবে না। তবে ফাসিক্ব, গোনাহগার বলা যাবে।[১৩]

অনুরূপভাবে আক্বীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে প্রকাশ্য কুফরী না করা পর্যন্ত কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। বরং ন্যায় কাজে শাসকের আনুগত্য করতে হবে। গোনাহগার শাসকের উদ্দেশ্যে সদুপদেশ দিতে হবে, সংশোধনের জন্য তার কাছে হক্ব কথা বলতে হবে, তাঁর হেদায়াতের জন্য দু'আ করতে হবে। প্রকাশ্য কুফরী করলে, মুসলিমরা ছালাতসহ দ্বীনী কার্যক্রম পরিচালনায় বাধাগ্রস্ত হলে এবং যুলুম নির্যাতনের শিকার হলে জনমত গঠনের মাধ্যমে বৈধ পন্থায় শাসকের প্রতি চাপ সৃষ্টি করতে হবে। কোন অন্যায় কাজে তার আনুগত্য করা বা সহযোগিতা করা যাবে না। এমনকি তার অন্যায় কাজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও যাবে না। নইলে এরূপ দ্বিমুখী স্বার্থপরতার পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। বরং যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিবাদ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَاطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই'।[১৪] অন্য হাদীছে আছে,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ قَالُوْا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ لَا مَاصَلُّوْا.

'তোমাদের মধ্যে অনেক আমীর হবেন, যাদের কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, কোন কাজ মন্দ মনে করবে। এক্ষণে যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজের প্রতিবাদ করবে, সে মুক্তি পাবে। যে ব্যক্তি ঐ কাজকে অপসন্দ করবে, সেও নিরাপত্তা পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ মন্দ কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে (সে মুক্তিও পাবে না, নিরাপত্তাও পাবে না)। ছাহাবীগণ বললেন, তাহলে কি আমরা তখন ঐ শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না, যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে'।[১৫] অন্য হাদীছে তিনি বলেন, أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ 'যে ব্যক্তি স্বৈরাচার শাসকের নিকটে হক্ব কথা বলে, তার জন্য সেটাই সর্বোত্তম জিহাদ'।[১৬]

দুঃখজনক হল, ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে খারেজীরা ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর মত জান্নাতী মানুষকে হত্যা করেছে এবং মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। একই কায়দায় বর্তমানে কিছু ইসলামপন্থী গ্রুপ নানা নাশকতা সৃষ্টি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবী করছে। এভাবে ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে এবং ছহীহ দাওয়াতের পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। কারণ অন্যায় দ্বারা কখনো অন্যায়ের প্রতিরোধ করা যায়। অনুরূপভাবে কোন অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করতে গিয়ে তা যদি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেই পথে অগ্রসর হওয়া যাবে না। ধৈর্যধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ছাহাবায়ে কেরামে বা সালাফীদের পন্থা অনুসরণ করতে হবে।[১৭] দাওরী (রাঃ) থেকে ইবনু তীন বর্ণনা করেন,

اَلَّذِىْ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ فِىْ أَمْرِ الْجَوْرِ أَنَّهُ إِنْ قُدِّرَ عَلَى خَلْعِهِ بِغَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَاظُلْمٍ وَجَبَ وَإِلَّا قَالُوْا وَجَبَ الصَّبْرُ.

'স্বৈরাচার শাসকদের সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা হল, বিশৃংখলা-বিপর্যয় এবং সীমালংঘন ছাড়াই যদি তার থেকে আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করা যায়, তাহলে তা অবশ্যই করা যাবে। অন্যথা ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব'।[১৮] ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রাঃ) বলেন, اَلصَّبْرُ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ أَصْلٌ مِّنْ أُصُوْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ 'স্বৈরাচার শাসকদের উপর ধৈর্যধারণ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি মূলনীতি'।[১৯]

---

১১. বিস্তারিত দেখুন লেখক প্রণীত 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন' শীর্ষক বই।
১২. ফিরাকুন মু'আছিরাহ, ১/২৭৪-৭৬ ও ২৮৫-২৯১ পৃঃ।
১৩. আবু ইসমাঈল আব্দুর রহমান আছ-ছাবুনী, আক্বীদাতুস সালাফ (কুয়েত : দারুস সালাফিয়াহ, ১৯৮৪ খৃঃ/১৪০৪ হিঃ), পৃঃ ৭১ ও ৮২-৮৩; ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ১/১০৮ পৃঃ, ও ৭/৬৭৩ পৃঃ; আল-ফিছাল ২/ ২৫২ পৃঃ।
১৪. শারহুস সুন্নাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬ 'নেতৃত্ব' অধ্যায়।
১৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১ 'নেতৃত্ব ও পদ মর্যাদা' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৭/২৩৩ পৃঃ।
১৬. তিরমিযী, আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭০৫।
১৭. কাৎফুছ ছামার, পৃঃ ১৩৪-১৩৬ ও ১৩৮; মুত্তফাক্ব আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৬৫, ৩৬৯৬ ও ৩৬৮-৭৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৬, ৩৬৭১, ৩৭০৫; ফাৎহুল বারী শরহে ছহীহ বুখারী ১৩/৮-১০ পৃঃ, হা/৭০৫২-৭০৫৭ 'ফিতান' অধ্যায়।
১৮. ফাৎহুল বারী ১৩/১০; এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছহীহ মুসলিম শরহে নববী, ১১ ও ১২ তম সংযুক্ত খণ্ড, পৃঃ ৪৩২-৪৩৫ ও ৪৪০, হা/৪৭৪৮-এর ব্যাখ্যা, 'ইমারত' অধ্যায়।
১৯. ঐ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/৫২৭ পৃঃ; এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ 'ভ্রান্তির বেড়াজালে ইক্বামতে দ্বীন' শীর্ষক বই।।

(৩০) পূর্বের আলেমগণ কোন ভুল করেননি বলে বিশ্বাস পোষণ করা। কারণ তারা বড় বড় আলেম ছিলেন। তাই তারা যা করে গেছেন বা বলে গেছেন, তারই অনুসরণ করতে হবে।

পর্যালোচনা :

উক্ত দাবী চরম বিভ্রান্তিকর। এ ধরনের আক্বীদা পোষণ করা মূর্খতার পরিচয়। তারা কি এমন কথা বলে গেছেন যে, আমরা যা করে গেলাম তা সবই সঠিক, একটিও ভুল করিনি? আমরা যা করে গেলাম ভুল হলেও তোমরা তা-ই করবে? পূর্বসূরি আলেমগণ কখনো এ ধরণের কথা বলতে পারেন না। কারণ কোন মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী আর ভুলকারীদের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ, যারা তওবা করে'।[২০] তাহলে বড় বড় আলেম ভুল করেননি এই দাবী কিভাবে ঠিক হতে পারে? আশ্চর্যজনক হল, রাসূল (ছাঃ)ও আদম সন্তান হিসাবে ভুল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অহি নাযিলের মাধ্যমে তা সংশোধন করে দিয়েছেন।[২১] অনুরূপ চার খলীফাসহ অন্যান্য ছাহাবীরও ভুল হয়েছে।[২২] বিশেষ করে ওমর (রাঃ) ছাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও অজানা ও স্মরণ না থাকার কারণে অনেক বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সঠিক বিষয় জানার পর বিন্দুমাত্র দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নিয়েছেন, গোঁড়ামী প্রদর্শন করেননি।[২৩] এমনকি আল্লাহ তা'আলা যাকে নির্বাচন করে মুজাদ্দিদ হিসাবে পৃথিবীতে পাঠান, তিনিও ভুল করতে পারেন বলে রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[২৪] সুতরাং পূর্বের বড় বড় আলেমদেরও ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তবে একথা অনুস্বীকার্য যে, পূর্বের আলেমগণ অনেক জানতেন, কিন্তু সবকিছু জানতেন একথা সঠিক নয়।

মনে রাখা আবশ্যক যে, ভুল সংশোধন না করে বাপ-দাদা বা বড় বড় আলেমদের দোহাই দেওয়া অমুসলিমদের স্বভাব *(বাক্বারাহ ১৭০; লোকমান ২১)*। **দ্বিতীয়তঃ** অনেক বিষয়ের প্রতি হয়ত পূর্ববর্তী আলেমগণের দৃষ্টি পড়েনি। যেমন কোন হাদীছ যঈফ, কিন্তু তাতে তাদের দৃষ্টি না পড়ার কারণে তার আলোকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরে তা যঈফ প্রমাণিত হয়েছে।

তাদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের কোন কৈফিয়ত নেই। বরং তাদের সঠিক প্রচেষ্টার পর ভুল হয়ে গেলে তারা একটি নেকী পাবেন।[৫] কিন্তু ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর সেই ভুলের উপর যারা আমল করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন হল, পূর্বের আলেম বা বড় বড় আলেম বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়? যেমন প্রচলিত মুনাজাতকে প্রায় ৮০০ বছর আগেই বিদ'আত বলা হয়েছে। আর যারা বিদ'আত বলেছেন তারা হলেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ মনীষী, যাদের মত জ্ঞানী পণ্ডিত পৃথিবীতে আর আসেননি। এমনকি সকল আলেমকে একত্রিত করলেও তারা তাদের একজনের সমান হবেন না। যেমন ইমাম ইবনু তায়মিয়া, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইমাম শাত্বেবী প্রমুখ বিদ্বান। তাহলে আগের আলেম বলতে বা বড় বড় আলেম বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়?

তৃতীয়তঃ সব আলেমই আপোসহীন নন। অনেক আলেম সঠিক বিষয়টি বুঝে তাৎক্ষণিক সংশোধন হন। আবার অনেকে ব্যক্তিস্বার্থ এবং ব্যবসা টিকে রাখার জন্য সঠিক জেনেও গোঁড়ামী করেন, অনেকে সঠিক বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করেন না। এছাড়াও সমাজের অধিকাংশ আলেম, ইমাম, খত্বীব, বক্তা সঠিক বিষয় জানার ব্যাপারে অলসতা ও অবহেলা করেন। তাছাড়া তাদের কাছে পর্যাপ্ত কিতাবপত্রও নেই । সুতরাং তাদের স্বচ্ছ ধারণা না থাকা ও ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

(৩১) বাপ-দাদারা যা করে গেছেন তারই অনুসরণ করতে হবে। কোনকিছু পরিবর্তন করা যাবে না।

পর্যালোচনা : বাপ-দাদা, বংশ, সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের আদর্শ যদি কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হয়, তাহলে তার বিরোধিতা করা নবী-রাসূলগণের সুন্নাত। ইবরাহীম, মূসা, ঈসা (আঃ), মুহাম্মাদ (ছাঃ)ই সেই সুন্নাত চালু করে গেছেন। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতা আযরের বিরুদ্ধে, মূসা (আঃ) চাচাত ভাই কারূণের বিরুদ্ধে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আপন চাচা আবু তালেব ও আবু জাহলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, তাদের নীতির বিরোধিতা করেছেন। অতএব বাপ-দাদা যা করেছেন তাই করতে হবে, এটা মুসলিমদের নীতি নয়। এটা ইহুদী-খ্রীষ্টান ও বিধর্মীদের নীতি। কারণ মুসলিম ব্যক্তি ভুল সংশোধন করে নেয়। আর বিধর্মীরা বাপ-দাদার ভুল ও মিথ্যা নীতির উপর অটল থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা তারই অনুসরণ কর, যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে, না আমরা তারই অনুসরণ করব, যার উপর আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি। যদিও তারা কিছু জানত না এবং হেদায়াত প্রাপ্তও ছিল না' *(বাক্বারাহ ১৭০)*। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তির আদর্শ হল, সর্বদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে গ্রহণ করে সঠিক বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া। চাই বাপ-দাদা করুক, বা না করুক কিংবা ভুল করুক। এরপরও কেউ যদি পূর্বপুরুষদের ভুল নীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, তাহলে তাকে বলতে হবে, পূর্ব পুরুষদের যুগে তো অনেক কিছুই ছিল না। তাই বর্তমানে যা কিছু নতুন আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলো সে যেন বর্জন করে।

উপসংহার :

আলোচিত ভ্রান্ত আক্বীদাগুলো প্রায় সবই শিরকী আক্বীদা। মুসলিমরা এই আক্বীদা নিয়েই ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত করছে, আর মনে করছে এগুলো আল্লাহ্র নিকট কবুল হচ্ছে। অথচ ছহীহ আক্বীদার মানদণ্ডে এগুলোর কোন মূল্যই নেই। ফলে মুছল্লীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, হাজী ও দানবীরের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে, কিন্তু দূর্নীতি, সন্ত্রাস, আত্মসাৎ, মওজুদদারী, মোনাফাখরী, প্রতারণা কমছে না, বরং বাড়ছেই। অতএব আক্বীদাকে পরিশুদ্ধ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদা পোষণ করার তাওফীক দান করুন এবং মুসলিম উম্মাহকে হেফাযত করুন- আমীন!!

---

২০. ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৯৯, ২/৭৬ পৃঃ,; মিশকাত হা/২৩৪১, পৃঃ ২০৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৩২, ৫/১০৪ পৃঃ।
২১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১২২৯, ১/১৬৪ পৃঃ এবং ১/৬৯ পৃঃ, (ইফাবা হা/১১৫৭, ২/৩৪৬); মিশকাত হা/১০১৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৫১, ৩/২৫ পৃঃ।
২২. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুআক্কেঈন ২/২৭০-২৭২।
২৩. বুখারী হা/৪৪৫৪, ২/৬৪০-৬৪১ পৃঃ, (ইফাব হা/৪১০২, ৭/২৪৪ পৃঃ), 'মাগাযী' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৩; ছহীহ মুসলিম হা/৫৭৫৩, ২/২১০ পৃঃ, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭।
২৪. ছহীহ বুখারী হা/৭৩৫২, ২/১০৯২ পৃঃ, (ইফাবা হা/৬৮৫০, ১০/৫১৮ পৃঃ), 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২১; মিশকাত হা/৩৭৩২, পৃঃ ৩২৪।

দাওয়াতের গুরুত্ব ও মূলনীতি

-আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ

ভূমিকা :

আরবী শব্দ 'দাওয়াত' শব্দের অর্থ আহ্বান করা, ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে নিঃশর্তভাবে সর্বশেষ অহির পথে মানুষকে আহ্বান জানানো। যার মূল ভিত্তি হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। আল্লাহ বিমুখ ও পথহারা মানুষকে আল্লাহমুখী করা এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সমাজকে প্রকৃত ইসলামী সমাজে রূপ দিতে দ্বীনের বিশুদ্ধ দাওয়াতী কার্যক্রম এক অনন্য মিশন। বিশ্বব্যাপী যখন ইহূদী, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, পৌত্তলিক ও তাদের পদলেহী বর্ণচোরা ইসলাম বিরোধী মিশনগুলো খুব চতুরতার সাথে নানাভাবে তাদের দাওয়াতী মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। এদেশের গরীব-অসহায় অশিক্ষিত লোকদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করে ধর্মান্তরিত করছে। তখনও আমরা তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে আমাদের ছোট ছোট বিষয়ের মতপার্থক্যের দরুন নিজেদের সর্বনাশে মেতে আছি। সর্বনাশ করছি শাশ্বত ইসলামের। প্রশ্নবিদ্ধ করে চলেছি ইসলামের মূল স্রোত-ধারাকে। ফলে আড়াল থেকে হাসছে ইবলীস ও তাদের দোসররা। অসন্তুষ্ট করছি বিশ্ব স্রষ্টাকে। মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য যেভাবে বাতিল মতাদর্শের প্রচারণা চলছে, এমন সময় দ্বীনের প্রকৃত দাওয়াতের আঞ্জাম দেওয়া বড়ই কঠিন। তাই প্রতিটি মুমিন ও মুসলিমের এ মহান দায়িত্বকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন নিঃশর্ত দাওয়াতী মিশনে নিজেদের শামিল করা এবং মনগড়া পদ্ধতি পরিহার করা। রাসূল (ছাঃ) যেভাবে তাবলীগ করেছেন তা ভালভাবে জেনে নিয়ে সেভাবে কাজ করা এবং তাবলীগের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে সহায়ক সব বৈধ পন্থা অবলম্বন করা।

যুগে যুগে সকল নবী ও রাসূলের শাশ্বত দাওয়াতী মিশনের প্রধান দু'টি দিক ছিল। একটি সৎকাজের আদেশ, অপরটি অসৎ কাজের নিষেধ। যা ইসলামে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে এদু'টির মধ্যে শুধু একটি আদায় করে অপরটি না করলে দাওয়াতী মিশন ব্যর্থতায় পর্যবশিত হবে। যুগপৎভাবে উভয়টিই সম্পাদন করতে হবে। সাথে সাথে স্থির করতে হবে দাওয়াতী মিশনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এগুতে হবে কতগুলো মৌলিক মূলনীতিকে সামনে রেখে। তবেই ইসলামী দাওয়াতী মিশনের চূড়ান্ত সফলতা প্রস্ফুটিত হবে। নিম্নে পাঠকের সমীপে ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, দাঈর গুণাবলী ও মূলনীতি উপস্থাপন করা হল।

ক. দাওয়াতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

যুগে যুগে সকল নবী ও রাসূলগণ দাওয়াত ও তাবলীগের মহান দায়িত্ব নিয়ে দুনিয়ার বুকে আগমন করেছিলেন এবং তাঁরা তা যথাযথভাবে সম্পাদনও করেছিলেন। যেমন-

(১) নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ- قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ- قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ- أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُم

'নিশ্চয় আমি নূহকে (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক মহান দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। তখন তাঁর সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি কখনো পথভ্রষ্ট নই। কিন্তু আমি বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল, তোমাদেরকে প্রতিপালকের বার্তা পৌঁছাই এবং তোমাদের সদুপদেশ দেই' *(আ'রাফ ৭/৫৯-৬২)*।

(২) হূদ (আঃ)-কে শক্তিশালী ও হটকারী 'আদ জাতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁর দা'ওয়াত সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. 'আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। অথচ তোমরা তো সবই মিথ্যারোপ করছ' *(হূদ ১১/৫০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ- 'হূদ (আঃ) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেও নির্বোধ নই বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল। তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী বিশ্বস্ত' *(আ'রাফ ৭/৬৭-৬৮)*।

(৩) ছালিহ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন সীমালঙ্ঘনকারী ছামূদ জাতির নিকট। তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ .

'ছামূদ জাতির প্রতি তাদের ভাই ছালিহকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনিই যমীন থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন' *(হূদ ১১/৬১)*।

(৪) প্রতারক মাদায়েনের অধিবাসীদের নিকট প্রেরিত নবী শু'আইব (আঃ)-এর দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ.

'মাদায়েনবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শু'আইবকে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আর তোমরা পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না' *(হূদ ১১/৮৪)*।

(৫) সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا- وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. 'হে নবী (মুহাম্মাদ (ছাঃ)! আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সংবাদদাতা ও সর্তককারীরূপে।

আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে দাওয়াতদাতা ও সমুজ্জ্বল প্রদীপরূপে' *(আহযাব ৩৩/৪৫-৪৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا– لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. 'নিশ্চয় তিনি তাঁর মনোনিত রাসূলের সামনে ও পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করে থাকেন। এটা জানার জন্য যে, রাসূলগণ তাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছেছেন কি-না' *(জিন ৭২২৭-২৬)*।

সুধী পাঠক! দাওয়াতের ব্যাপারে এধরনের গুরুত্ববহ নির্দেশনার কারণেই মহানবী (ছাঃ) দাওয়াতের গুরু দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্য মহান আল্লাহ এবং উপস্থিত ছাহাবীগণকে সাক্ষ্য রেখে শঙ্কামুক্ত হওয়ার জন্য বিদায় হজ্জের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

হে মানবমণ্ডলী! ক্বিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে (আমি আল্লাহ্র বাণী পৌঁছিয়েছি কি-না) তখন তোমরা কি বলবে? সকলেই সমস্বরে বলে উঠল, আমরা এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্র বাণী পৌঁছেছেন, আমানত পূর্ণ করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন। অতঃপর মহানবী (ছাঃ) তাঁর শাহাদত আঙ্গুল আকাশের দিকে করলেন এবং তা মানুষের দিকে ফিরিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক'। একথা তিনি তিনবার বললেন' *(মুসলিম ১/৩৯৭ পৃঃ হা/৩০০৯, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪৬২)*।

মহানবী (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে এটাও বলেছিলেন যে, 'যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছে তারা অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার বাণী পৌঁছে দিবে। কেননা উপস্থিত অনেকের চেয়ে অনেক অনুপস্থিত ব্যক্তি আমার এ বক্তব্যের অধিক গুরুত্ব দিবে এবং সত্য বলে মনে করবে' *(বুখারী হা/৭০৭৮)*।

রাসূল (ছাঃ) চিরদিন পৃথিবীর বুকে থাকার জন্য আসেননি। আল্লাহ্র অমর বিধান অনুযায়ী অন্যান্য সৃষ্টির মত তাকেও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। বিদায় হজ্জ পর্যন্ত এ পৃথিবীর মাত্র কয়েক লক্ষ লোক দ্বীন ইসলামের আলো পেয়েছিল। অথচ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব জাতির নিকট দ্বীনের এ দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। মুহাম্মদ (ছাঃ) এরপর আর কোন নবী আসবেন না। তিনিই ছিলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাই আল্লাহ তা'আলা দ্বীন প্রচারের এ গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর। আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ 'তোমাদের মাঝে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى.

'আমার নিকট এই কুরআন অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদের সবাইকে সাবধান করতে পারি' *(আন'আম ৬/১৯)*।

খ. দাওয়াতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য :

পৃথিবীতে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন কোন কাজ নেই। এমনকি মহান আল্লাহ মানুষ ও জিন জাতিকেও সৃষ্টি করেছেন এক বিশেষ ও মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আর তা হল মানুষ ও জিন জাতি একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতী কাজ করার পিছনে কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন-

১. মানুষকে অন্ধকার ও গোমরাহী থেকে হিদায়াতের আলোয় নিয়ে আসা :

মহান আল্লাহ বলেন, الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ 'আলিফ লাম রা, (হে নবী!) এই কিতাব, ইহা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বরে করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোতে , তার পথে যিনি পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ' *(ইবরাহীম ১৪/১)*। এখানে 'অন্ধকার' বলতে পথভ্রষ্টতা, গোমরাহী, অন্যায়, পাপাচার, গুনাহ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।

২. মানুষের আক্বীদা ও আমল সমূহ বিশুদ্ধ করা :

আক্বীদা বা অন্তরনিহিত দৃঢ় বিশ্বাস ও আমল ঠিক না হলে দাওয়াত কোনই কাজে আসবে না। বরং দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তার সকল আমলই বিফলে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا 'আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি ক্বিয়ামত দিবসে মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দিব' *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

মানুষ দুনিয়াতে অনেক আমল করবে কিন্তু তাদের আমলগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মাফিক না হওয়ায় ক্বিয়ামতের দিন তা কোন কাজে আসবে না মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের। আর এরূপ না করে তোমাদের আমলগুলো বরবাদ কর না' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩৩)*। তাই দাওয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ যে, এর মাধ্যমে মানুষের আক্বীদা ও আমল পরিশুদ্ধ করা।

৩. মানুষকে জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা :

মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*।

৪. হক্ব ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় :

হক্ব ও বাতিলের মাঝে যেখানে সংমিশ্রণ ঘটেছে কুরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে তা সমাধান করে সত্যকে সত্য হিসাবে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা হিসাবে চিহ্নিত করা দ্বীনি দাওয়াতের অন্যতম লক্ষ্য। মহান আল্লাহ বলেন, وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ '(কুরআন) সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশক এবং হক্ব ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

৫. আল্লাহ্র নিকট ওযর পেশ করা :

মহান আল্লাহ প্রদত্ত দাওয়াতের আমানত সাধ্যমত আদায় করার মাধ্যমে ক্বিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ্র নিকট ওযর পেশ করা এবং কৈফিয়ত প্রদান থেকে রক্ষা পাওয়াও অন্যতম উদ্দেশ্য। যেমন বনী ইসরাঈল জাতির একদল শনিবারে মাছ ধরার নির্দেশ অমান্য করলে অন্য দল যখন তাদেরকে সীমালঙ্ঘন করতে

নিষেধ করল এবং তখন আরেক দল বলেছিল, তোমরা অযথা কেন তাদের ভয় দেখাচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিবেন। তখন (মু'মিনরা) জবাবে বলেছিল, مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ওযর পেশ করার জন্য এবং এজন্য যে, সম্ভবত তারা সর্তক হবে' *(আ'রাফ ৭/১৬৪)*।

গ. দাওয়াতদাতার গুণাবলী :

যারা দাওয়াতের ন্যায় মহৎ কাজের আঞ্জাম দিবেন তাদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণের অধিকারী হওয়া দরকার। তা না হলে ঐ দাঈর দাওয়াত মানুষের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। নিষ্ফল হয় দাওয়াতী কার্যক্রম। নিম্নে দাঈর মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী উল্লেখ করা হল-

১. আল্লাহভীরু হওয়া :

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ 'যারা আল্লাহ্র বাণীসমূহ পৌঁছে দেয় তারা কেবল তাঁকেই ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না' *(আহযাব ৩৩/৩৯)*।

২. ইখলাছ বা বিশুদ্ধ নিয়ত হওয়া :

একজন দাঈর নিয়তটা এমনভাবে বিশুদ্ধ হতে হবে যাতে দাওয়াত একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই হয়। তবেই দাওয়াতটা আল্লাহ্র কাছে কবুল হবে এবং এর পূর্ণ নেকী পাওয়া যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ '(হে নবী) আপনি বলুন! এটা আমার পথ, আমি আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করি' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। দা'ওয়াত ও তাবলীগ আল্লাহ্র পথে এবং একমাত্র তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করতে হবে। ত্বাগূত বা শয়তানের পথে হলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ 'তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তারা যেন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে, তারই জন্য দ্বীনের প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে' *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫)*।

সুধী পাঠক! আমল কবুলের পূর্ব শর্ত হল, ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা। ইখলাছের সাথে নিয়মিত সামান্য আমলই মুক্তির অছীলা হতে পারে। কিন্তু ইখলাছশূন্য প্রচুর আমল কোনই কাজে আসবে না। এজন্য নিয়তকে সর্বদা বিশুদ্ধ রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى 'সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অতএব মানুষ যা নিয়ত করে তাই প্রতিফলিত হয়' *(বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১)*।

৩. কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান অর্জন করা :

দাওয়াতী কাজ করার পূর্বে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান অর্জন করা দাঈর জন্য একান্ত কর্তব্য। তা না হলে সে সঠিকভাবে দ্বীনের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে পারবে না। স্বয়ং আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে দাওয়াতের পূর্বে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। নবুঅত প্রাপ্তির পর মহানবী (ছাঃ)-এর উপর সর্বপ্রথম অহী ছিল জ্ঞানার্জনের আদেশ সম্বলিত। যেমন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ '(হে নবী) আপনি পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে যিনি (সকল কিছু) সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 'জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত মা'বূদ নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। উল্লেখিত কুরআনের প্রথম আয়াতে اِقْرَأْ 'তুমি পড়' এবং ২য় আয়াতে فَاعْلَمْ 'আপনি জ্ঞানার্জন করুন' আদেশসূচক। উল্লেখিত আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাওয়াতের পূর্বে অবশ্যই সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা অতীব যরূরী। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي 'আপনি বলুন! এটাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করি' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, এখানে بَصِيرَةٍ বলতে এমনভাবে জ্ঞানার্জন করা, যা হক্বকে বাতিল থেকে পৃথক করে দেয় *(ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/৯৩ পৃঃ)*।

৪. ধৈর্যশীল হওয়া ঃ

এখানে اَلصَّبْرُ বা ধৈর্য বলতে, মানুষের প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতাকে রোধ করতে ও সংযম রাখতে চেষ্টা করাকে বুঝানো হয়েছে।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ধৈর্যধারণ করা প্রত্যেক দাঈর জন্য অতীব যরূরী, যার কোন বিকল্প নেই। এ মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পূর্বে অনেক নবী ও রাসূল তাদের নিজ নিজ উম্মতের নিকট অপমানিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও দেশান্তরিত হয়েছেন, এমনকি নির্মমভাবে হত্যার শিকারও হয়েছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও মক্কার কুরাইশ, মুশরিক, ইহূদী ও মুনাফিক্বদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। কা'বা ঘরে ছালাতরত অবস্থায় উটের ভুঁড়ি তাঁর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। জন্তু-জানোয়ারের উচ্ছিষ্ট ও দুর্গন্ধ ময়লা-আবর্জনা তাঁর বাড়ীতে ফেলা হয়েছে। তায়েফে উগ্র কপট লোকদের লেলিয়ে দেওয়া বালকদের পাথরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তে রঞ্জিত হয়েছেন। তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, বের করে দেওয়া হয়েছে নিজ মাতৃভূমি থেকে *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১৪৯)*। তারপরেও কখানো তিনি দাওয়াতের কাজ থেকে পিছপা হননি। ধৈর্যধারণ করে নিরলসভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালিয়ে গেছেন। একইভাবে ইসলাম গ্রহণ আর দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে ছাহাবীদের উপরও নেমে আসে অসহানীয় যুলুম-নির্যাতন। বেলাল, খাব্বাব, মুছ'আব বিন উমাইর, ছুহাইব বিন সিনান, আবু ফুকায়াহ, আমের বিন কুহাফা, ইসলামের প্রথম শহীদা সুমাইয়া ও ইয়াসার পরিবারের সদস্যদের মত ছাহাবায়ে কোরামের উপর নেমে এসেছে অবর্ণনীয়, অমানবিক সব নির্যাতন। উত্তপ্ত বালুময় মরুভূমিতে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। দেহকে দ্বি-খণ্ডিত করা হয়েছেম ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে। তাদের অপরাধ কী? তাদের অপরাধ একটাই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এ স্বীকৃতি দিয়েছে *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১০৬)*। এত কিছুর পরও তারা কখানো দ্বীনের পথ থেকে বিচ্যুত হননি, পিছপা হননি দ্বীনের দাওয়াত থেকে। অতএব আমাদেরও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ধৈর্যের সাথে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 'আর যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে (তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(আছর ৩)*।

৫. আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা রাখা :

কাউকে দাওয়াত দেওয়া বা দাওয়াতী কাজে বের হওয়ার পূর্বে মহান আল্লাহ্র উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখা প্রতিটি দাঈর

একান্ত কর্তব্য। তাহলে দাওয়াতে বরকত হবে এবং সহজেই মানুষ হেদায়াত লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ '(হে রাসূল) আপনি বলুন! আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, ভরসাকারীরা তাঁর উপরই ভরসা করে' *(যুমার ৩৯/৩৮)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটা পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন' *(ত্বালাক্ব ৩)*।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً 'তোমরা যদি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্র উপর ভরসা করো, তবে পাখিদের মতো তোমাদেরও তিনি রিযকের ব্যবস্থা করবেন। তারা ভোরবেলা খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা ভরা পেটে ফিরে আসে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫২৯৯, সনদ ছহীহ)*।

সুধী পাঠক! এভাবে আমরাও যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য, তাঁর দ্বীনকে যমীনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দাওয়াতী মিশন পরিচালনা করি, তাহলে দেখব আমাদের ব্যবসা বা রিযকের কোন ক্ষতি হচ্ছে না; বরং হক্কের পথে থাকলে আমাদের ধন-সম্পদ ও রিযক আরো বৃদ্ধি পাবে। কেননা রিযকের মালিক স্বয়ং আল্লাহ। যেভাবে তিনি ক্ষুধার্ত পাখিদের আহারের ব্যবস্থা করে থাকেন, তেমনি আমাদের জন্যও তা করবেন। শুধু প্রয়োজন তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা ও তাওয়াক্কুল।

৬. দাওয়াত অনুযায়ী আমল করা :

প্রত্যেক দাঈ যে বিষয়ে মানুষকে দাওয়াত দিবে নিজে তার উপর আমল করতে হবে। তাহলে সে কথায় বরকত হবে এবং মহান আল্লাহ খুশী হবেন এবং মানুষের উপর তার কথার প্রতিক্রিয়া হবে। ফলে দাওয়াত ফলপ্রসূ হবে। অন্যথায় এ দাওয়াত কোন উপকার বয়ে আনবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন কথা কেন বল? যা তোমরা নিজেরাই বাস্তবায়ন কর না। তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ' *(ছফ ২-৩)*।

পূর্বে ইহূদীরা ভাল কাজের আদেশ করত অথচ নিজেরাই তা করত না। তাই আল্লাহ তাদের ধমক দিয়ে বলেন, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ 'কি আশ্চর্য! তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ কর অথচ তোমরা নিজেরাই তা করতে ভুলে যাও। আর তোমরা কিতাব পাঠ করছ, তারপরও কি তোমরা উপলব্ধি করবে না' *(বাক্বারাহ ২/৪৪)*।

উসামা বিন যায়িদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, এক ব্যক্তিকে ক্বিয়ামত দিবসে নিয়ে আসা হবে। তারপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর জাহান্নামে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে উদরের বাইরে ঝুলতে থাকবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনিভাবে গাধা (আটা পিসার) যাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার কাছে জমা হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে না? সে উত্তরে বলবে, হ্যা, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজ করতে আদেশ করতাম কিন্তু নিজেই তা করতাম না। আর খারাপ কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করতাম, অথচ আমি নিজেই তা করতাম *(বুখারী হা/৩২৬৭; মুসলিম হা/৭৬৭৪; মিশকাত হা/৫১৩৯)*।

৭. হক্বকে প্রকাশ করা ও বাতিলের সাথে সংমিশ্রণ না করা :

হক্বকে হক্ব হিসাবে এবং বাতিলকে বাতিল হিসাবে প্রচার করা একজন দাঈর উপর প্রকৃত আমানত। দ্বীনের দাঈকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান ও হুকুমগুলো সঠিক ও নির্ভুলভাবে বর্ণনা করতে হবে। হক্বকে কোন ভাবেই বাতিলের সাথে সংমিশ্রণ করা যাবে না। মানুষ গ্রহণ করুক বা না করুক হক্ব কথা বলা থেকে বিরত থাকা যাবে না। নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবীদের বাস্তব আমলগুলো ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজের কাছে পৌঁছাতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا '(হে রাসূল) আপনি বলুন! হক্ব এসেছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে। যার ইচ্ছা ঈমান আনবে আর যার ইচ্ছা কুফরী করবে। নিশ্চয় আমি যালিমদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি' *(কাহাফ ২৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 'তোমরা হক্বের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ করো না, আর তোমরা জেনে-শুনে হক্বকে গোপন করো না' *(বাক্বারাহ ২/৪২)*।

মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করা ও নিজের দলে নেওয়ার জন্য ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে যঈফ, জাল ও ভিত্তিহীন হাদীছ এবং মিথ্যা-বানোয়াট বুযুর্গানে দ্বীনের কল্প-কাহিনী বলে মানুষের কাছে দাওয়াত দেওয়া কোন দাঈর জন্য সমীচীন নয়। ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে-ছালেহীনগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা মানুষকে দাওয়াত দিতেন। ফলে সহজেই তারা দাওয়াত কবুল করত। মিথ্যা ফযীলতের ধোঁকা দিয়ে মানুষকে দ্বীনের পথে আনার চেষ্টা করতেন না। এভাবে তাঁদের বেলায় সম্ভব হলে আমাদের বেলায় কেন নয়? এক্ষণে কেউ যদি মনে করে, মানুষকে যেভাবেই হোক হেদায়াত করাই আসল উদ্দেশ্য। সেখানে সত্য-মিথ্যা, যঈফ-জাল, ভিত্তিহীন গল্প-কাহিনী খতিয়ে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। তাহলে এটা সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত হবে। এর ভয়াবহতা অত্যন্ত কঠিন। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলল, যা আমি বলিনি, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে তৈরী করে নেয়' *(বুখারী হা/১১০; মিশকাত হা/১৯৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ 'কোন মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে (যাচাই-বাছাই ছাড়া) তাই বলে' *(মুসলিম হা/৭; মিশকাত হা/১৫৬)*।

৮. সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া :

একজন দাঈর সবচেয়ে বেশী দরকার উত্তম আখলাক্ব ও সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। যে দাঈর আখলাক্ব ও চরিত্র যত সুন্দর তার দাওয়াতী কাজ তত বরকতময় ও ফলপ্রসু। উত্তম চরিত্র বলতে সদা সত্য কথা বলা, আল্লাহকে সর্বদা ভয় করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, ইখলাছের সাথে সমস্ত ইবাদত করা, নম্র-ভদ্রভাবে হাসিমুখে কথা বলা, লৌকিকতা

পরিহার করা ইত্যাদি সৎ গুণসমূহকে বুঝায়। মহানবী (ছাঃ) তাঁর উত্তম আখলাক্বের জ্যোতি দিয়েই তৎকালীন জাহেলী যুগের বর্বর মানুষেগুলোকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় নিয়ে আসতে পেরেছিলেন। এজন্য কোন অস্ত্র বা তলোয়ারের প্রয়োজন হয়নি। তাঁর চরিত্র ও ব্যবহারের উৎকর্ষতা দেখেই সে যুগের বিধর্মীরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম কবুল করেছিল। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ 'অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী' *(ক্বলম ৬৮/৪)*।

নাউওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) বলেন, سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ فَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নেকী ও গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নেকী হল উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া। আর গুনাহ হল যে কাজ করলে তোমার অন্তরে খটকা লাগে। আর মানুষের কাছে তা প্রকাশ হওয়াকে তুমি অপসন্দ কর' *(মুসলিম হা/৬৬৮০; মিশকাত হা/৫০৭৩)*। এক কথায় একজন দাঈ আখলাক্ব-চরিত্রে ছাহাবায়ে কেরামের মূর্তপ্রতীক হবে। তার চরিত্র এতটাই সুন্দর হবে, যাতে তাকে সত্যিকারের আল্লাহ্র খাঁটি বান্দা মনে হয়। তার কথা শুনে যেন মানুষ মহাসত্যের দিকে ছুটে আসে। পক্ষান্তরে তার চরিত্র যদি ভাল না হয়, তাহলে লোকেরা তার কথা শুনবে না, তাকে মূল্যায়নও করবে না। ফলে ঐ দাওয়াত ফলপ্রসূ হবে না।

ঘ. আল্লাহর পথে দাওয়াত প্রদানের মূলনীতি :

নিয়মনীতি ও লক্ষ্যবিহীন কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় না। সাময়িকভাবে কিছু সফলতা দৃষ্টিগোচর হলেও সামগ্রিকভাবে তাকে সফলতা বলা যায় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দানের জন্যও বেশ কিছু মূলনীতি ও পদ্ধতি রয়েছে, যা একজন দাঈ বা মুবাল্লিগের অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য। যাতে পথহারা মানুষগুলোকে খুব সহজেই ছিরাতুল মুস্তাক্বীমের পথে আনা যায়।

১. হিকমত অবলম্বন করা :

দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি। এতে খুব সহজে মানুষ দাওয়াত গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়। মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ '(হে নবী) আপনি হিকমতের মাধ্যমে আপনার প্রভুর রাস্তায় দাওয়াত প্রদান করুন' *(নাহল ১৬/১২৫)*। অত্র আয়াতে 'হিকমত' বলতে জ্ঞান, দূরদর্শিতা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনু জারীর (রহঃ)-এর মতে 'হিকমত' হল কুরআন ও হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহ্বান করা *(তাফসীরে তাবারী ৭/৬৬৩ পৃঃ; ইবনু কাছীর ২/৬১৩ পৃঃ)*।

২. উত্তমভাবে সদুপদেশ দেওয়া :

দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে একজন দাঈর জন্য মানুষকে উত্তমভাবে সদুপদেশ দেয়া একান্ত যরূরী। এতে মানুষের সাথে দাঈর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সদুপদেশমূলক উত্তম কথাকে সাফল্যের সোপানও ধরা যায়। মহান আল্লাহ বলেন , ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ '(হে নবী) আপনি (মানুষকে) হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করুন' *(নাহল ১৬/১২৫)*। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, সদুপদেশ দ্বারা ঐ উপদেশকে বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে ভয় ও ধমক থাকে, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে আর শাস্তি হতে বাঁচার উপায় অবলম্বন করে *(তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৬১৩ পৃঃ)*। এ ভাল উপদেশ ও কথা কুরআন, সুন্নাহ, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে-ছালেহীনের জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে হতে হবে। যবরদস্তি করে দাওয়াতের কাজ করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ - لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ 'আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। আপনি তাদের শাসক বা দারোগা নন' *(গাশিয়াহ ৮৮/২১-২২)*।

৩. (প্রয়োজনে) উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা :

দাওয়াতের কাজে কোথাও হয়ত তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন হতে পারে। যাদের অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ বিদ্যমান, যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে হক্ব কথা মেনে নিতে নারাজ, তাদের সাথে কখনো বির্তকের প্রয়োজন হলে উত্তম ও পসন্দনীয় পন্থায় তার জওয়াব দিতে হবে, যাতে করে সে মনক্ষুণ্ন না হয়। উত্তম পন্থায় বিতর্কের অর্থ হল কথা-বার্তায় নম্রতা ও কমলীয়তা অবলম্বন করা। এমন যুক্তি-প্রমান পেশ করা, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। তবে অধিক উত্তম হল তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলা। মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ-وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

'তারা যেন এ (শরী'আতের) ব্যাপারে আপনার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে দাওয়াত দিন। নিঃসন্দেহে আপনি সঠিক পথে আছেন। তারা যদি আপনার সাথে ঝগড়া করে তবে বলে দিন, তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন' *(হজ্জ ২২/৬৭-৬৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 'আর তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বির্তক করুন' *(নাহল ১৬/১২৫)*। তিনি আরো বলেন, ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ 'আপনি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করুন, তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু' *(ফুছ্ছিলাত ৪১/৩৪)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের দাওয়াত প্রদানকারীকে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। চরমশত্রু ও দুশমনকেও যদি ধৈর্য সহকারে অমায়িক ও ভদ্রভাবে দাওয়াত প্রদান করা যায়, তাহলে সেও একদিন অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হবে। মহান আল্লাহ মূসা ও তাঁর ভাই হারুন (আঃ)-কে কাফের শাসক ফেরাঊনের কাছে দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে বলেন, اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى - فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى 'তোমরা উভয়ে ফেরাঊনের কাছে যাও, সে আল্লাহদ্রোহী হয়ে গেছে। তোমরা তার সাথে খুব নম্রভাবে কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বহা ২০/৪৩-৪৪)*।

৪. দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা :

আল্লাহ্র পথে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া প্রতিটি মানুষের জন্য যরূরী। দাওয়াতের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। কেউ যদি দাওয়াত কবুল নাও করে তবুও একাজ বন্ধ রাখা যাবে না। সদা সর্বদা

খুব নিষ্ঠার সাথে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। নূহ (আঃ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا- فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا- وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا- ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا- ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا.

'তিনি (নূহ) বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই কেবল বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি, যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর। তারা কানে আঙ্গুলী দেয়, নিজেদেরকে বস্ত্রাবৃত করে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি, আর ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারেও দাওয়াত দিয়েছি' *(নূহ ৭১/৫-৯)*। দাঈ রাতে ও দিনে যখনই সময় পাবেন তখনই মানুষের কাছে সুযোগ বুঝে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিবেন। প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক। নূহ (আঃ) দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর বেঁচে ছিলেন। উক্ত দীর্ঘ সময়ে মাত্র ৮০ জন লোক তাঁর দাওয়াত কবুল করেছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি নিরাশা হয়ে দাওয়াত দেয়া ছেড়ে দেননি *(তাফসীর ইবুন কাছীর ৮/২৩১ পৃঃ)*।

৫. কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী দাওয়াত দেয়া :

দ্বীনের পথে আহ্বানকারী প্রতিটি লোকের জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী দাওয়াত প্রদান একান্ত যরূরী। কোন আমল বা ইবাদতের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে মনগড়া কোন বক্তব্য, ভিত্তিহীন গল্প-কাহিনী, মওযূ' বা জাল হাদীছ বর্ণনা করে কোন ভাইকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা বৃথা। কেননা দাঈর নিজের স্থান অনেক আগেই জাহান্নামে নিশ্চিত হয়ে গেছে। তাই দাওয়াতী কাজের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে দু'টি, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 'আমি তো আমার প্রতি যা অহী অবতীর্ণ হয় তারই অনুসরণ করি। বস্তুতঃ আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই, তাহলে আমি ক্বিয়ামতের কঠিন দিনের শাস্তির ভয় করি' *(ইউনুছ ১০/১৫)*। বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (ছাঃ) বলেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ 'আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, সেগুলো ভালভাবে আঁকড়ে ধরলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টি বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত' *(মুয়াত্তা ইমাম মালিক হা/৩৩৩৮; মিশকাত হা/১৮৬)*।

৬. সর্বাগ্রে তাওহীদ, অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পর্যায়ক্রমে পেশ করা :

দাওয়াতদাতা তার দাওযাতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে প্রথমে পেশ করবে। তবে সর্বাগ্রে নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। আর ক্ষেত্র ও অবস্থা বুঝে দাওয়াতের পদ্ধতি বিভিন্নরকম হওয়া যরূরী। মুসলিমদের কাছে দাওয়াত দিলে তার পদ্ধতি হবে একরকম। আবার অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াত দিলে তার পদ্ধতি হবে কিছুটা ভিন্ন রকম। মহানবী (ছাঃ) যখন মুয়ায বিন জাবালকে অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন, তখন তাকে তাদের মাঝে দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন,

إِنَّكَ تَأْتِى قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ».

'তুমি আহলে কিতাবদের কাছে যাচ্ছ, সেখানে গিয়ে তাদেরকে প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দিবে এই মর্মে যে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল ও বন্দা। যখন তারা এ কালেমার দাওয়াত গ্রহণ করবে তখন তাদেরকে রাত ও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের দাওয়াত দিবে। এটা যখন তারা মেনে নিবে, তারপর তাদেরকে জানাবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীরা আদায় করবে এবং গরীবদের মাঝে বণ্টন হবে। এটাও যখন তারা মেনে নিবে তখন তুমি তাদের সম্পদের মূল্যের ব্যাপারে ও মাযলূমের দো'আ থেকে সাবধান থান। কেননা তাদের ও আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা থাকে' *(মুসলিম হা/১৩০; মিশকাত হা/১৭৭২)*। এখানে দাওয়াতের প্রথমে ঈমান বা কালেমা, তারপর ছালাত, তারপর যাকাত, এভাবে ক্রমান্বয়ে দাওয়াত পেশ করতে বলা হয়েছে। এভাবে দাওয়াত পেশ করলে মানুষ খুব সহজে তা গ্রহণ করে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসবে। একথায় ইসলাম যে একটি শান্তির ধর্ম এবং আল্লাহ্র কাছে একমাত্র মনোনীত ও বিশ্বের সার্বজনীন ধর্ম আগে তা সুন্দরভাবে তাদেরকে বুঝাতে হবে। আর যদি মুসলিমদের কাছে এ দাওয়াত পৌঁছানো হয়, সেক্ষেত্রে বিষয়গুলো কিছুটা ভিন্ন হবে। মুসলিমদের আমলের অবস্থার দিকে খেয়াল করে সে অনুযায়ী দাওয়াত দিতে হবে। তাদের মাঝে যে যে আমলে ঘাটতি দেখা যাবে সেগুলোর দিকে আগে দাওয়াত দিতে হবে। আর তার গুরুত্ব উপলব্ধি করাতে হবে। যেমন কারো ঈমান ও তাওহীদ দুর্বল থাকলে তাকে সে সম্পর্কে বুঝাতে হবে। কেউ ছালাত না পড়লে তাকে ছালাতের দাওয়াত দিতে হবে। এভাবে যার ভিতর যে আমল নেই সে সম্পর্কে প্রথমে তাকে দাওয়াত দিতে হবে। এভাবে দায়িত্ব নিয়ে আমরা যদি দাওয়াতী কার্যক্রম চালাতে পারি, তবে সফলতা আমাদের অবশ্যম্ভাবী। ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার :

পরিশেষে একজন সত্যিকারের মুসলিম হিসাবে বাতিল অপশক্তির আগ্রাসন থেকে দ্বীন ইসলামের হেফাযতের জন্য দ্বীনী দাওয়াতের প্লাটফরমে অতন্দ্রপ্রহরীর ভূমিকায় অবতরণের বিকল্প নেই। আল্লাহ বিমুখ পথ হারা মানুষকে আল্লাহমুখী করতে এবং কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সমাজকে ইসলামের মূল স্রোত ধারায় ফিরিয়ে আনতে একদল নিবেদিত প্রাণ দাঈর আজ বড় অভাব। আল্লাহ আমাদেরকে একজন প্রকৃত দাঈ হিসাবে কবুল করুন-আমীন!!

[লেখক : তৃতীয় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

-বযলুর রহমান

ভূমিকা :

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ বিপ্লবাত্মক এক সমাজ সংস্কার ও দাওয়াতী কাফেলার নাম। বাংলাদেশে উক্ত সংগঠন তার সংস্কার কার্যক্রম সমাজে চারটি ধারায় (মুরুব্বীদের মাঝে ‘আন্দোলন’, যুবকদের মাঝে ‘যুবসংঘ’, মহিলাদের মাঝে ‘আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা’, শিশু-কিশোরদের মাঝে ‘সোনামণি’) পরিচালনা করছে। এরই একটি অঙ্গসংগঠন ‘সোনামণি’। **‘সোনামণি’** একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন। ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার সূরা হজ্জের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের আলোকে ‘সোনামণি’ সংগঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। আদর্শিকভাবে উক্ত সংগঠনটি যে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর কালজয়ী আদর্শে আদর্শিত হওয়ার অনুপ্রেরণা এর মূলমন্ত্র। যার পরিচয় বিধৃত হয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে। তাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হল এর গঠনতান্ত্রিক তথা সার্বজনীন সংবিধান। শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা (জ্ঞান) সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা হল এর ঈর্ষান্বিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাবলীগ বা প্রচার, তানযীম বা সংগঠন, তারবিয়াত বা প্রশিক্ষণ এবং তাজদীদে মিল্লাত বা সমাজ সংস্কার হল এর নিয়মতান্ত্রিক কর্মসূচী। এছাড়াও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক যুগোপযোগী, বাস্তব ও বিজ্ঞানসম্মত পাঁচটি নীতিবাক্য ও দশটি অনুসরণীয় গুণাবলী রয়েছে। যা সঠিকভাবে অনুসরণ, অনুকরণ ও যথাযথ প্রতিপালনের মাধ্যমে দিকভ্রান্ত, নির্যাতিত ও অবহেলিত শিশু মানবতা নিজেদের অধিকার ফিরে পেয়ে শান্তির রাজ্যে অবগাহন করতে পারবে। ফলে সমাজে অন্যায়-অত্যাচার ও অশান্তি বলে কিছুই থাকবে না। শান্তির সুখময় পরিবেশ বিরাজ করবে সমাজের আনাচে কানাচে। মানুষ পাবে অফুরন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস। তাই ‘সোনামণি’ সংগঠনের গুরুত্ব বর্তমান সময়ের একান্ত দাবী।

১. প্রকৃত মানুষ গঠনে :

বিশ্বে আজ প্রকৃত মানুষের বড় অভাব। মানুষ আজ অন্যায় ও অসত্যের পূজারী। জীবন চলার গতিপথে মানুষ আজ অসংখ্য বাঁধার সম্মুখীন। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হল তারা সর্বদা সত্য-সুন্দরের প্রতি ধাপিত হতে চায়। কিন্তু পারিপার্শ্বিক সীমাবদ্ধতা আর বিজাতীয় সভ্যতার হিংস্র আক্রমণে মানুষ আজ ন্যায়-নীতি ও সত্য পথ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। তাই প্রকৃত মানুষের সন্ধানে বিশ্ববাসী আজ অপেক্ষমাণ। কোথায় পাওয়া যাবে প্রকৃত মানুষের সন্ধান? কোথায় পাওয়া যাবে ন্যায়ের অনুসারী আপোসহীন একদল নিবেদিত কর্মী বাহিনী? যেখানে থাকবে না ধনী-দরিদ্রের মাঝে কোন বৈষম্য। থাকবে না বর্ণ, ভাষা, গোত্র, অঞ্চল প্রভৃতি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী হায়েনার হিংস্র থাবা। থাকবে না ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা। যে সমাজে মানুষ পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাবে। শান্তি ও নিরাপত্তা হবে জীবন চলার মূল পাথেয়। তাক্বওয়া হবে মানুষের মাঝে পার্থক্য নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড। তাই প্রকৃত মানুষ গঠনের মূল বৈশিষ্ট্য হবে তাক্বওয়া। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

‘হে মানুষ সকল! নিশ্চয় আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। অতঃপর তোমাদের পরস্পরের মাঝে পরিচিতিকরণের জন্য তোমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি। নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে অধিক তাক্বওয়াশীল। নিশ্চয় আল্লাহ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ের খবর সম্পর্কে সর্বজ্ঞ *(হুজুরাত ৪৯/১৩)*।

সুধী পাঠক! ইসলামের বিধান স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও দীপ্তিমান। ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো, আরবী-আজমীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ময়দানে শেষ ভাষণে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى.

‘হে মানুষ সকল! তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। অতএব সাবধান! কোন আরবীর উপর কোন আজমীর মর্যাদা নেই। আবার কোন আজমীর উপর কোন আরবীর মর্যাদা নেই। লালের উপর শুভ্রের কোন মর্যাদা নেই আবার শুভ্রের উপর লালেরও কোন মর্যাদা নেই। তবে (সকলের মাঝে পার্থক্যগত মানদণ্ড হল) তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি।[২৫]

অতএব বর্তমানে প্রকৃত মানুষের খুবই প্রয়োজন। আর ‘সোনামণি’ সংগঠন এদেশের শিশু-কিশোরদের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় অন্তর জগতে ঢুকিয়ে দিয়ে একজন তাক্বওয়াশীল প্রকৃত মানুষে পরিণত করতে তার সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং শিশু-কিশোরদের প্রকৃত মানুষ তৈরীতে ‘সোনামণি’ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. প্রকৃত মুসলিম তৈরীতে :

পরিচিতির দিক দিয়ে বিশ্বের মনুষ্য সমাজের মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় পরিচয় হল আমরা মুসলিম। জন্মগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করা প্রত্যেক মানুষই মুসলিম। অতঃপর তার পিতা-মাতা ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে সে জন্মগত ফিতরাত থেকে দূরে সরে যায়।

২৫. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ (মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, রিয়ায, তাবি) হা/২৭০০, ৬/২০৩ পৃঃ; ইমাম শাওকানী, নায়লুল আওত্বার হা/২০৪৬, ৫/৯৯ পৃঃ।

অনুরূপভাবে শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মানুষেরা শিরক ও বিদ'আতে হাবুডুবু খাচ্ছিল। তারা নারীদের কোন মূল্যায়ন করত না, পিতার সম্পত্তিতে নারীদের কোন অংশ দিত না, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলত। এছাড়া অসংখ্য মূর্তি পূঁজার জয়জয়কর ছিল। মূলতঃ তিনি শিরকের শিখণ্ডীদের মূলে কুঠারাঘাত করে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতিষ্ঠাদান এবং বিদ'আতের নখর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে বিশুদ্ধ সুন্নাহ বাস্তবায়নে জীবন অতিবাহিত করেন।

সুধী পাঠক! উক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক নবী ও রাসূল তাঁদের স্ব স্ব উম্মতের মাঝে প্রধানতঃ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত আক্বীদা ও বিদ'আতী আমল সংশোধন করে সামাজের সার্বিক সংস্কার সাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 'আমরা প্রত্যেক উম্মতের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা ও ত্বাগূতকে বর্জন করার আহ্বান জানানোর জন্য' *(নাহল ১৬/৩৬)*। অতএব বিশুদ্ধ আক্বীদার গুরুত্ব অত্যধিক।

আক্বীদা বা বিশ্বাসের গুরুত্ব এত বেশী যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ ও তাঁর সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকার কারণে তিনি জনৈক এক বালিকা রাখালকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার নির্দেশ দেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِيْ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِيْ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُوْنَ لَكِنِّيْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا؟ قَالَ ائْتِنِيْ بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

মু'আবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, আমার একজন দাসী ছিল। ওহুদ ও জাওয়ানিয়্যাহ নামক স্থানে সে আমার ছাগল চরাত। একদিন দেখি, নেকড়ে বাঘ একটি ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমি একজন আদম সন্তান হিসাবে অনুরূপ রাগান্বিত হলাম, যেরূপ তারা হয়। ফলে আমি তাকে এক থাপ্পড় মারলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি একে বড় অন্যায় মনে করলেন। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে মুক্ত করে দিব না? তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আসমানে। তিনি তাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? তখন সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে একজন ঈমানদার মেয়ে'।[২৭]

২৭. মুসলিম হা/১২২৭, ১/২০৩; আবুদাউদ হা/৯৩০,৩২৮২; মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৮১৩; মিশকাত হা/৩৩০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৬১।

'আল্লাহ কোথায়' এবং 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে' মৌলিক এই প্রশ্ন দু'টির সঠিক উত্তর দেওয়াতে বালিকা দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পায়। অতএব উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নিঃসন্দেহে ইসলামে সর্বাগ্রে শিশুদরকে বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই আক্বীদা বা বিশ্বাস মূলতঃ আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী, আসমানী কিতাব সমূহ, রাসূলগণ, ক্বিয়ামত দিবস এবং তাক্বদীরের ভাল ও মন্দের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করাকেই বুঝায়। 'সোনামণি' সংগঠনই কেবলমাত্র শিশুদেরকে সঠিক ও বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা দেওয়ার উপর জোরালো ভূমিকা পালন করে থাকে। যা অন্য কোন শিশু সিংগঠনে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অতএব শিশুর নৈতিকতা বিকাশে ও স্থিতিশীল জীবন-যাত্রার জন্য সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪. আদর্শ পরিবার গঠনে :

নেতৃত্বশূন্য ও অশান্ত এ পৃথিবীতে নেতৃত্ব সৃষ্টি ও শান্তির রাজ্যে পরিণত করতে শিশুদের সুষ্ঠু বিকাশ ও সঠিক নিরাপত্তা বিধানের গুরুত্ব অপরিসীম। আর এর প্রথম ধাপ হল 'পরিবার'। কেননা পরিবার হল সমাজের ক্ষুদ্রতম মানবগোষ্ঠী। পরিবারই একটি শিশুর 'প্রাথমিক বিদ্যালয়'। যেখানে শিক্ষকের ভূমিকায় থাকেন মাতা ও পিতা।

শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ শিশুর যাবতীয় দৈহিক, মানসিক, বস্তুগত ও অবস্তুগত প্রয়োজন মিটায় পরিবার। পরিবারেই শিশু তার চিন্তা, মনন, আবেগ ও কর্মের অভ্যাস গঠন করে। মূলতঃ শিশুর চরিত্রের ভিত্তি রচিত হয় পরিবারেই। সমাজের একজন যোগ্য ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের অবদান সবচেয়ে বেশী। এক্ষেত্রে পরিবার যদি আধুনিকতার পুচ্ছধারী হয়, অপসংস্কৃতির লালনকারী হয়, অবসর সময়কে আড্ডাবাজী, গান-বাজনা, টিভি-সিনেমা ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে অতিবাহিত করে তাহলে এর ধ্বংসাত্মক প্রভাব একটি শিশুকে প্রভাবিত করে অতি দ্রুত। ফলে তার স্বচ্ছ আদর্শ বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যা বর্তমানে হরহামেশা ঘটছে। আর এ সমস্ত কারণে অধিকাংশ শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অকালে ঝরে পড়ছে। পরবর্তিতে পেটের দায়ে শিশু শ্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ফুলের মত জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে। কেউবা আবার নেশায় উম্মক্ত হয়ে নিজের গর্ভধারিণী মাকে চাকু দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করছে। কেউ সন্ত্রাসী হচ্ছে। কেউ চোর, ডাকাত প্রভৃতিতে জড়িয়ে পড়ছে। অথচ এটা আদৌ কাম্য নয়। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও...*(তাহরীম ৬৬/৬)*।

পিতা-মাতা ও অভিভাবকরা যদি ইসলামের সনিষ্ঠ অনুসারী হয় তাহলেই কেবল পরিবার আদর্শ হবে। অন্যথায় নয়।

সুধী পাঠক! পরিবার সংস্কার বা সংশোধন না হলে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুপম আদর্শের অনুসারী না হলে সকলকেই জাহান্নামের ইন্ধন হতে হবে। এজন্যই 'সোনামণি' সংগঠন একটি পরিবারকে কিভাবে ইসলামী আদর্শের অনুসারী

করানো যায় তার দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। ফলে একজন সোনামণি তার শৈশবকাল থেকে ইসলামী পরিবারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারে। সুতরাং ইসলামী পরিবার গঠনে 'সোনামণি' সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৫. শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে :

অন্যায়-অত্যাচার, অশান্তি, যুলুম-নির্যাতন, পরস্পর হানাহানি-রাহাজানী, ঘুম-খুন-হত্যা-অপহরণ-ক্রসফায়ার প্রভৃতিতে সমাজ আজ অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত। সামাজিক শৃঙ্খলা ক্রমবর্ধমানহারে বিলুপ্ত হচ্ছে। সুখ-শান্তির সেই সুনির্মল পরিবেশের পরিচ্ছন্ন আবরণ দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে। অশান্তির অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলছে সমাজের শান্তিকামী মানুষের হৃদয়। হাহাকার করছে নির্যাতিত মানবতার নিষ্পিষ্ট আত্ম। যেমন বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের কারণে ধর্ম পালনে মানুষ দ্বিধাগ্রস্তের মধ্যে পতিত হচ্ছে। অর্থনীতির নামে সূদ-ঘুষের ব্যক্তি পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক পুঁজিবাদের হিংস্র ছোবলে মানুষ আয়-রোজগারের প্রকৃত বরকত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার রাজনীতির নামে মস্তিষ্কপ্রসূত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন ইযম বা মতবাদসমূহের অন্ধ অনুসরণ করে ধর্মের গণ্ডিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যহত রেখেছে।

সুধী পাঠক! উক্ত প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, শান্তিতে ভরপুর এক অনিন্দ্য সুন্দর নির্মল সমাজের খুব প্রয়োজন। আর সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সেই পদ্ধতির দিকে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, যে পদ্ধতির মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীন তাদের খেলাফত পরিচালনা করেছিলেন। যে পদ্ধতিতে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) চার লক্ষ বর্গমাইলের বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। আর তা হল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। এই দু'টির মধ্যে যা কিছু আছে সেগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে, তাহলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। মূলতঃ সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় সকল শ্রেণী তথা ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র মানুষের একত্রে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের মাধ্যমে। যেখানে থাকবে না কোন হিংসাত্মক মনোভাব, থাকবে না দলাদলি নামক মারণাস্ত্রের ভয়ংকর আক্রমণ। থাকবে না অহংকারে বিষবাষ্প, থাকবে না গোয়েন্দাগিরি, চোগলখোরী, দ্বি-মুখি নীতির ভয়াবহতা। বরং সকলে মিলেমিশে ভাই ভাই হয়ে থাকবে। সম্মান-শ্রদ্ধা, স্নেহ-ভালবাসা ও স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্যের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'নিশ্চয় প্রত্যেক মুমিন ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার বিবাদিয় বিষয়গুলোর শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে দাও। অতঃপর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে করে তোমরা আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত হতে পার' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। আর 'সোনামণি' সংগঠন শিশুদের মাঝে 'আল্লাহভীতি' এবং 'সমাজে বসবাসরত সকলে পরস্পর ভাই' এই আদর্শ শিক্ষা দিয়ে দুষিত ও অশান্ত এই সমাজে শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহের জন্য তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

৬. ইসলামী বিধান প্রতিপালনে :

পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। উক্ত ইবাদত যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য যুগের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। পরিধিগত তারতম্যের ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক নবী ও রাসূলের জীবনের মিশন ছিল এক ও অভিন্ন। তন্মধ্যে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শরী'আত ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত ও সমাগত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। মানুষের আধ্যাত্মিক বিষয় থেকে শুরু করে জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কোন্ নীতিতে সে তার জীবনকে পরিচালনা করবে, তিনি তার নীতিমালা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন এবং তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামগণ তা যথাযথভাবে পালন করেছেন ও সমাজে তার বাস্তবে রূপদান করেছেন। যেমন কিভাবে, কখন এবং কোথায় ছালাত আদায় করতে হবে, কিভাবে ছিয়াম পালন করতে হবে, কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে, কিভাবে পরিবার পরিচালনা করতে হবে, কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে, কিভাবে শাসন ও বিচার বিভাগ পরিচালনা করতে হবে, কিভাবে আহার বা পানাহার করতে হবে, কিভাবে পেশাব-পায়খানা করতে হবে প্রভৃতি বিষয়গুলো উম্মতের সম্মুখে পেশ করেছেন। আর তাঁর উম্মতের মাঝে আল্লাহ কর্তৃক বান্দার উপরে কয়েকটি বিষয় আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে শিশুদের তার শৈশব কাল থেকে ছহীহ শরী'আত পালনের প্রতি আকর্ষণ ও আগ্রহী করে তুলতে হবে। দশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পরে যেন সে ইসলামের বিধান পূর্ণাঙ্গরূপে প্রতিপালন করতে পারে এ ব্যাপারে অভিভাককদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা যরূরী। আর 'সোনামণি' সংগঠন এদেশের শিশু-কিশোরদের মাঝে ইসলামী চেতনা বা জ্ঞান সৃষ্টি করে তাদের জীবনকে নিখাদ ইসলামী জীবনরূপে গঠন করতে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। সুতরাং ভঙ্গুরপ্রায় মুসলিম প্রধান আমাদের এই দেশ বাংলাদেশে সমাজে ইসলামী বিধান প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ হিসাবে সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক।

৭. শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নে :

শিশুরা আজ বড়ই লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত। তাদের জীবনের সম্মান বা মর্যাদা আজ অপ্রতুল। পারিবারিকভাবে তারা কঠিন বৈষম্যের শিকার। তারা জীবন ধারণের যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত। অধিকারকে দুই ভাবে ভাগ করা যায়। (১) জন্মগত ও বৈষয়িক অধিকার (২) ধর্মীয় অধিকার। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন একটি শিশুর জন্মগত ও বৈষয়িক অধিকার। ধর্মীয় অধিকারের মধ্যে প্রথমে আল্লাহ্র তাওহীদের বাণী তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করানো, তাহনীক করা, সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করা, সুন্দর মাধুর্যপূর্ণ ও অর্থবহুল নাম নির্বাচন ও তার মাথার চুল চেঁছে ফেলা এবং সাধ্যমত চুলের ওযনে রোপা ছাদাক্বাহ করা, সাত বছর বয়সে উপনীত হলে তাকে ইসলামের ফরযিয়াত ও সুন্নাত অনুসরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, দশ বছর হলে ইসলাম প্রতিপালনের চাপ সৃষ্টি করা বা বাধ্য করা, ইসলামী পোশাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করানো, ধর্ম প্রতিপালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া প্রভৃতি।

যদি উক্ত অধিকার যথাযথভাবে পালিত হয় তাহলে একটি শিশু সে যেমন জাগতিক জীবনের অভ্যন্তরস্ত যাবতীয় অধিকার ভোগ করে সামাজিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে, তেমনি ধর্ম পালন করে সে তার সার্বিক জীবনকে ধর্মের রঙ্গে রঞ্জিত করে জীবনকে

সৌন্দর্যময় করে তুলবে। অতঃপর একজন সফল ব্যক্তি হিসাবে সমাজে আত্মপ্রকাশ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 'সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি জাগতিক জীবনের সৌন্দর্য সদৃশ' *(কাহাফ ১৮/৪৬)*। অন্যদিকে শিশুরা বিশ্ব সভ্যতার রক্ষাকবচ। ইসলামী জীবনাদর্শে মানব সন্তান তথা মানবশিশু হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নে'মত। পিতা-মাতার চোখ জোড়ানো ধন। মানব প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কর্ণধার এবং বিশ্ব মানবতার সমৃদ্ধ জীবনের আশার আলো। আর শিশুর নিরাপত্তা বিধান, অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণে ইসলাম আপোসহীন। তাই ইসলাম মানব শিশুর জন্মের পবিত্রতা, নিরাপত্তা, লালন-পালন, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও আদর্শ মানবরূপে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ তাকীদ দিয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে মেধা, মনন, আত্মা ও পরিবেশের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ প্রদান তাদের সুসামঞ্জস্য জীবনের অন্যতম নিদর্শন। এক্ষেত্রে 'সোনামণি' সংগঠন শিশুদের জীবনের সার্বিক অধিকার বাস্তবায়নে সোচ্চার ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৮. শিশুর নিরাপত্তা বিধানে :

বিশ্বের শিশু-কিশোররা আজ চরমভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। প্রতিদিন হাযারো শিশু পৃথিবীর এই আলো বাতাসে আগমন করে কিংবা আগমনের পূর্বেই আবার হারিয়ে যায় অন্ধকার গহ্বরে। পিতা-মাতার চরম দেওলিয়াত্ব, দায়িত্বহীনতা আর জাগতিক চিন্তাধারার উন্মাদনায় বিলুপ্ত হয় অসংখ্য শিশুর সোনালী জীবন। আদরের সন্তানকে অন্য মানুষের নিকটে রেখে তারা নগদ অর্থ প্রাপ্তির নগ্ন নেশায় ছুটে বেড়ায়। অথচ মায়ের একটু আদর-স্নেহ, ভালবাসা পাওয়ার আশায় সর্বদা ব্যাকুল হয়ে ওঠে শিশুর মন। কিন্তু মা দুনিয়ার এই চাকচিক্যময় উজ্জ্বল পরিবেশে প্রদর্শনীর নামে বিভিন্ন অসামাজিক ও অন্যায় কর্মকাণ্ডসমূহে জড়িয়ে পড়ে। ফলে শিশুরা মায়ের মমতা থেকে বঞ্চিত হয়। বঞ্চিত হয় আদব-কায়দা ও শাসন থেকে। একপর্যায়ে মনের অজান্তেই ঐ শিশু পারিবারিক বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সম্পৃক্ত হয় নানা পরিবেশে। ঘটায় নানাবিধ অপরাধকর্ম। অন্তর্ভুক্ত হয় বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমিক দলে। শুরু হয় জীবন যুদ্ধের অসহায় পদক্ষেপ। অসুস্থ পরিবেশ, অসৎ বন্ধু বা সহপাঠী এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ প্রভৃতি একটি শিশুর জীবনের নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকিস্বরূপ। যা বর্তমান শিশুদের মধ্যে প্রকট আকার ধারণ করেছে। অথচ ইসলাম দেড় হাযার বছর পূর্বে শিশুর জীবনের যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান করেছে। এজন্য শিশুর লালন-পালন বা নিরাপত্তার স্বার্থে সন্ধ্যার সময় শিশুকে বাড়ির বাইরে বা ছাদের উপরে যেতে দেওয়া স্পষ্ট নিষেধ। কারণ এ সময় শয়তান ও বিষাক্ত পোকা-মাকড় তাদের খাদ্য আহরণের জন্য বাইরে বের হয়। এমতাবস্থায় শিশুরা বাইরে থাকলে তাদের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বেশী। হাদীছে এসেছে,

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ فَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًاوَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ.

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন সন্ধ্যা হয়, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে বাড়ির বাইরে যেতে দিও না, কারণ সে সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু অংশ পার হলে তাদের ছেড়ে দাও এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে ঘরের দরজা বন্ধ কর। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আর 'বিসমিল্লাহ' বলে তোমাদের দ্রব্যাদির পাত্রের মুখগুলো বন্ধ কর এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ। বন্ধ করার কিছু না থাকলে কোন বস্তু (বিসমিল্লাহ বলে) রাখ। আর শোয়ার সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও।[২৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً 'আর সন্ধ্যার সময় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরের ভিতরে আবদ্ধ রাখ। কেননা এ সময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং (শিশুদের) ছিনিয়ে নেয়'।[২৯]

সুধী পাঠক! নিঃসন্দেহে ইসলামই শিশুকে যথাযথভাবে তার জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করেছে। আর 'সোনামণি' সংগঠন শিশুদের জীবন ও ইযযতের নিরাপত্তা প্রদান এবং তা যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য শিশু-কিশোরদেরকে জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

[ক্রমশঃ]

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি]

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

বযলুর রহমান প্রণীত

সোনামণিদের
পবিত্রতা অর্জনের শিষ্টাচার

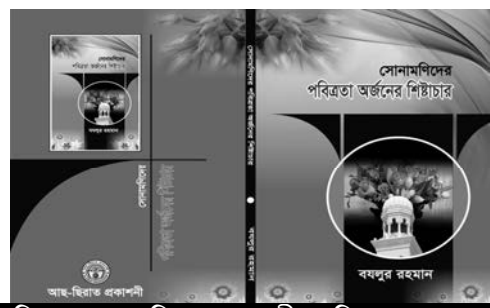

প্রাপ্তিস্থান : আছ-ছিরাত প্রকাশনী, হাফিয আমেনা প্লাজা, নওদাপাড়া মাদরাসা সংলগ্ন, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৩০-৬৩৩৪০৩; ০১৭৩৮-০২৮৬৯২

২৮. বুখারী হা/৫৬২৩ 'বাসন ঢেকে রাখা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম হা/৫৩৬৮; মিশকাত হা/৪২৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১০৯ 'বাসন ঢেকে রাখা' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪০।

২৯. বুখারী হা/৩৩১৬; মুসনাদে আহমাদ হা/১৫২০৬; মুসনাদু আবি ই'আলা হা/২১৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩২৫৬; মিশকাত হা/৪২৯৫; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১০৯।

ইখলাছ অর্জনের উপায়

-আব্দুল গাফফার বিন আব্দুর রাযযাক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১. আল্লাহকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন :

আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। তিনি হলেন বড় ধনী, মহিয়ান, সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান এবং অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সর্বজ্ঞাতা। তাঁরই হাতে উপকার-অপকার। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি যা চান তাই হয় আর যা চান না তা হয় না। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দয়া, অনুগ্রহ ও ইহসান মাত্র। বান্দার অস্তিত্ব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক মহান দান, যা সে নিজে তার কাছে চায়নি বা সে আল্লাহ ছাড়া এমনিতেই অস্তিত্ব পায়নি। বরং তার একজন মহান স্রষ্টা আছেন। প্রত্যেকটি নে'মত, কল্যাণ, বদান্যতা এবং অনুগ্রহ সবকিছুই তাঁর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 'তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্য অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ' *(ইবরাহীম ১৪/৩৪)*। অতএব তাঁর হক আমাদের প্রতি মহান। বান্দা তাঁর সে হক্ব পূরণ করতে খুবই দুর্বল ও অপারগ। সে তাঁর নে'মতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে অধিক পরিমাণে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা অকৃতজ্ঞদের জন্য শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্র বাণী, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে অবশ্যই তোমাদেরকে আরো বৃদ্ধি করে দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে আমার শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর' *(ইবরাহীম ১৪/৭)*। বেশী বেশী শুকর আদায় করলে ঈমান শক্তিশালী হয় এবং বান্দার ইখলাছ ও মনোযোগ তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি বৃদ্ধি হতে থাকে। অতএব ইখলাছ অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল, আল্লাহকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা।

২. ইখলাছের জ্ঞানার্জন :

ইখলাছ লাভের অন্যতম পন্থা হল এ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করা এবং সে বিষয়গুলো অবগত হওয়া যেগুলোর মাধ্যমে তা দূর হয়ে যায়। অথবা তা পূর্ণতার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায়।[৩০] এ কারণে আহলুল ইলম তথা জ্ঞানীরা নিয়তের জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে গুরুত্বারপ করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনু কাছীর বলেন, تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل 'তোমরা নিয়তের জ্ঞানার্জন কর, কেননা তা আমলের পরিপূরক'।[৩১] মাক্বদেসী (রহঃ) বলেন,

'হায় আমার আফসোস! কিভাবে নিয়ত পরিশুদ্ধ হবে? যে তার প্রকৃতি জানে না অথবা মুখলিছ কিভাবে তার আত্মার নিকট সততার দাবী করতে পারে? যতক্ষণ সে তার অর্থ বাস্তবায়ন না করবে। অতএব একজন বান্দার সর্বপ্রথম কর্তব্য হল আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা। প্রথমত সেটা অর্জনের জ্ঞান লাভ করা। অতঃপর তা আমলের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করবে ইখলাছ ও ছিদক্বের প্রকৃতি বুঝার পরে। যে দু'টি বান্দার জন্য নাজাতের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম'।[৩২]

৩. ইখলাছের ছাওয়াব এবং ইখলাছ না করার শাস্তির কথা স্মরণ করা :

বান্দা সর্বদা যেন তার নিয়ত স্বচ্ছ রাখে, তার ফযীলত ও ছাওয়াবের কথা স্মরণ করে। কেননা সেটি আমল কবুলের অন্যতম শর্ত এবং জান্নাতে প্রবেশের একমাত্র অবলম্বন। অন্যদিকে শয়তানের ষড়যন্ত্র ও কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপত্তার মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ- إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

'সে (শয়তান) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে যে বিপদগামী করলেন তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মকে অবশ্যই শোভন করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকেই বিপদগামী করব। তবে তাদের মধ্যে যারা মুখলিছ বান্দাগণ তারা ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৩৯-৪০)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ - وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ- أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ- فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ- فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ- عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.

'তোমরা অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে। তবে তারা নয়, যারা আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা। তাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিযক্ব, ফল-মূল আর তারা হবে সম্মানিত, জান্নাতুন নাঈমে তারা মুখোমুখি হয়ে বসে থাকবে' *(ছাফ্ফাত ৩৭/৩৮-৪৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোন আমল গ্রহণ করেন না একমাত্র তাঁর একনিষ্ঠ ও সন্তুষ্টির নিয়ত ব্যতীত'।[৩৩]

পক্ষান্তরে ইখলাছ শূন্যতার শাস্তির কথা চিন্তা করতে হবে। যার ফলে বান্দার আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং তা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ইহকাল ও পরকালের আযাবের মাধ্যম হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ- أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

---

৩০. ইখলাছ ওয়াশ শিরকুল আছগার, পৃঃ ১৪।
৩১. হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/৭০ পৃঃ।
৩২. মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাসেদীন, পৃঃ ৩৬০।
৩৩. নাসাঈ হা/৩১৪০, সনদ ছহীহ।

‘যে কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের পূর্ণ ফল দান করি এবং সেথায় তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। তাদের জন্য আখেরাতে অগ্নি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই এবং তারা যা করে আখেরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক’ *(হূদ ১১/১৫-১৬)*।

৪. নফসের পর্যবেক্ষণ ও সাধনা :

কোন কাজে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে নিজের আত্মার তত্ত্বাবধান করবে। সে নিজেকে প্রশ্ন করবে, তার মাধ্যমে সে কি চায়? যদি সে ক্ষেত্রে নিয়ত পরিশুদ্ধ থাকে, তাহলে অগ্রসর হবে। আর বিশুদ্ধ না থাকলে সে কাজের পূর্বে তা পরিশুদ্ধ করে অগ্রসর হতে হবে। এই পদ্ধতিই হচ্ছে সালাফদের। তাই হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন,

كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت فإن كان لله مضا إن خالته شك أمسك.

‘এক ব্যক্তি যখন সে ছাদাক্বার ইচ্ছা পোষণ করত তখন সে তার নিয়ত স্থির করত। যদি তা শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্য হত তখন তা বাস্তবায়ন করত অন্যথা কোন সংশয় সংমিশ্রিত হলে তা থেকে বিরত থাকত’।[৩৪] তবে রিয়ার আশঙ্কায় কোন কাজ পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া যাবে না। বরং প্রত্যেকটি কাজ ইখলাছের সাথে বাস্তবায়ন করাই মুখ্য।

৫. আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা :

বান্দা তার প্রয়োজন আল্লাহ্র নিকট প্রকাশ করবে এবং বেশী বেশী দো‘আ করবে, যেন তিনি তাকে ইখলাছ অর্জনের তাওফীক্ব দান করেন। কেননা তিনিই তো অন্তর পরিবর্তনকারী, এ জন্য তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ইখলাছ অর্জনের উপায়। এ কারণে আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি প্রত্যহ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ বারংবার বলতে ফরয করে দিয়েছেন।

ইখলাছ বাস্তবায়নে এবং শিরক বিচ্ছিন্নতায় আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনার ভূমিকা মহান। এ প্রসঙ্গে ইবরাহীম (আঃ)-এর দো‘আ উল্লেখযোগ্য। তিনি দো‘আ করতেন, وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে শিরক থেকে দূরে রাখুন’ *(ইবরাহীম ১৪/৩৫)*।

আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে মানব সকল! তোমরা শিরককে ভয় কর। কেননা নিশ্চয় তা পিপীলিকার হামাগুড়ির চেয়েও সুক্ষ্ম। অতঃপর তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ যাকে চান সে বলবে, (বলা হল) হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাহলে আমরা কিভাবে তা থেকে বেঁচে থাকব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা নিম্নোক্ত দো‘আটি পাঠ করবে,

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ.

‘হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে শিরক থেকে পানাহ চায়, যেটা আমি জানি এবং ঐ শিরক থেকে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি যা আমরা জানি না’।[৩৫]

৬. বেশী বেশী ভাল কাজ করা :

শয়তানের কামনা হল, মানুষ পুরোপুরি আমল করা থেকে বিরত থাকবে অর্থাৎ আমল করলেও যেন সেটা সঠিক পদ্ধতি অনুপাতে না হয়। অতঃপর শয়তান যখন বুঝতে পারে, বান্দা তার আনুগত্য করছে না অবাধ্য হচ্ছে এবং যখন সে তাকে কোন কুমন্ত্রণা দেয় এর ফলে বান্দার ইখলাছ ও ইবাদত আরো বৃদ্ধি হতে থাকে। তখন সে তার শয়তানী কাজ থেকে বিরত থাকে, যেন তার কারণে ইবাদত বেশী না হয়। ইবরাহীম তামীমী বলেন,

إن الشيطان ليدع العبد إلى الباب من الاثم فلايطيعه وليحدث عند ذالك خيرا– فإذا راه كذالك ترك–

‘নিশ্চয় শয়তান বান্দাকে পাপের দরজার দিকে আহ্বান করে। অতএব সে তার অনুসরণ করে না এবং ঐ সময় উত্তম কথা বলে। যখন শয়তান বান্দাকে এরূপ করতে দেখে তখন সে পলায়ন করে’।[৩৬]

ফুযাইল ইবনু গাযওয়ান থেকে বর্ণিত, একদা তাকে বলা হল যে, অমুক ব্যক্তি আপনার বদনাম করছে। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ! ঐ ব্যক্তির প্রতি আমার ক্রোধ যে তাকে আদেশ করেছে। তাকে বলা হল, কে তাকে আদেশ করেছে? উত্তরে তিনি বলেন, শয়তান। অতঃপর তিনি তার জন্য দো‘আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন’।[৩৭]

৭. আত্ম-আশ্চার্যবোধ ত্যাগ করা ও সৃষ্টির প্রতি মূল্যায়ন করা :

বান্দার ভিতরে শয়তান প্রবেশের সবচেয়ে বড় প্রবেশদ্বার হচ্ছে, সে তার আমলগুলো দেখিয়ে আত্ম-আশ্চার্যবোধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর আমল দ্বারা আত্ম আশ্চার্যবোধ করা অন্তর দ্বারা শিরক করার শামিল[৩৮] এবং সেটা আমলকে বড় মনে করার একটি উৎস। এটা আল্লাহ্র উপর খোটা দানকারীর ন্যায়। তাইতো সে আল্লাহ্র নে‘মতের কথা ভুলে যায়। ফলে সে ইখলাছশূন্য হয়ে যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

‘তারা আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে কর। বল, তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করিও না; বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’ *(হুজুরাত ৪৯/১৭)*।

এটি আমল বিধ্বংসী কাজ। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, জেনে রেখ! যে ব্যক্তি তার আমল নিয়ে আশ্চার্যবোধ করবে তার আমল

৩৪. জামেউল বায়ান ৩/৭০ পৃঃ।

৩৫. মুসনাদে আহমাদ হা/১৯৬২২, সনদ হাসান।
৩৬. ইহইয়া উলূমুদ্দীন ৩/৩১৫ পৃঃ।
৩৭. ইহইয়া উলূমুদ্দীন ৩/১৪ পৃঃ।
৩৮. মাজমু‘আ আল ফাতওয়া লি ইবনে তায়মিয়া ১০/২৭৭ পৃঃ।

ধ্বংস হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যে গর্ববোধ করবে তার আমলও ধ্বংস হয়ে যাবে *(শরহে আরবাঈন নববী)*।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, তুমি মনে রাখ, যখন বান্দা কথা বা আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং সে অবগত যে এটা শুধুমাত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার প্রতি অনুগ্রহ, এটা তার কোন চিন্তা-চেতনা, যোগ্যতা, শক্তি ও ক্ষমতার বলে নয়। বরং সেই সত্তা যিনি তার প্রতিদান দিয়েছেন, যিনি তাকে বাকশক্তি-অন্তর-চক্ষু-কর্ণ দান করছেন। যখন সে এগুলো নিয়ে গবেষণা করে তখন তার ভিতরে আশ্চার্যবোধ আসতে পারে না। আর যখন সে তার প্রভুর অনুগ্রহের কথা ভুলে যাবে তখন তার ভিতরে আশ্চার্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কথা ও আমল বাতিল হয়ে যাবে'।[৩৯]

অতএব আমাদের উচিত হবে সদাসর্বদা আমাদের প্রতি আল্লাহ্র দানকৃত অনুগ্রহগুলো স্মরণ করা এবং একমাত্র তাঁর প্রতিই ভরসা করা। কেননা ইচ্ছা করলে কেউ কাউকে ক্ষতি করতে পারে না, যদি তিনি না চান। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ

'জেনে রাখ! যদি জাতির সকলে কোন বিষয়ে তোমাকে উপকার করার জন্য একত্রিত হয়, তাহলে তারা তোমার কোন কিছুই উপকার করতে পারবে না তা ব্যতীত, যা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। আর যদি তারা সকলে কোন বিষয়ে তোমাকে ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়, তাহলে তারা তোমার কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না, তবে তা ব্যতীত যা আল্লাহ তোমার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং পৃষ্ঠা শুকিয়ে গেছে'।[৪০]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'একটি অন্তরে ইখলাছ এবং প্রশংসার মহব্বত একত্রিত হতে পারে না, যেটি মানুষের নিকট আছে। যেমন আগুন ও পানি, সাপ ও মাছ একত্রিত হতে পারে না। যখন তোমার আত্মা ইখলাছের আবেদন করবে তখন তুমি সর্বপ্রথম কামনার প্রতি অগ্রসর হও এবং তুমি তাকে নিরাশার ছুরি দ্বারা যবেহ কর। যখন তুমি এইগুলো সাধন করতে সক্ষম হবে তখন তোমার জন্য ইখলাছ করা সহজ হবে'। মূলতঃ লোক দেখান কাজে অপকার ছাড়া কোন উপকার নেই। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ 'যে ব্যক্তি লোক শোনানো ইবাদত করে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার লোক শোনানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো ইবাদত করবে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার লোক দেখানো উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিবেন'।[৪১]

খাত্ত্বাবী এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যে ব্যক্তি ইখলাছ ছাড়া কোন আমল করল এবং সে তা দ্বারা মানুষকে শুনানো ও দেখানোর আশা পোষণ করে তাহলে তাকে তাই প্রদান করা হয়'। ইবনু হাযার বলেন, 'যে ব্যক্তি তার আমলের মাধ্যমে মানুষের নিকট মান-সম্মান কামনা করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট আলোচনার পাত্র বানিয়ে দেন যারা তাদের মর্যাদা মানুষের নিকট চাই এবং পরকালে তাদের জন্য কোন ছাওয়াব নেই'।[৪২]

৮. শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করা :

ইখলাছ প্রতিহতকারী সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল ইখলাছহীন ব্যক্তিদেরকে সাথী হিসাবে গ্রহণ করা। কেননা একজন ব্যক্তির সহচর তার চরিত্র সুন্দর ও নষ্ট করতে প্রভাবশালী। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে অনুসরণ ও সাদৃশ্যের দিকে ধাবিত বরং মানুষ অন্য মানুষের স্বভাব অনুসরণ করে যা সে জানে না।[৪৩]

যে ব্যক্তি মুখলিছদের সাথে চলাফেরা করে সে ব্যক্তির মধ্যে ইখলাছ আন্দোলিত হয়। আর যে ব্যক্তি আহলুর রিয়া ও সুখ্যাতি অর্জনকারী ব্যক্তির সাথে উঠাবসা করে সে তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ 'মানুষ তার বন্ধুর চরিত্র অনুসরণ করে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই ভাবুক সে কাকে বন্ধু করবে'।[৪৪]

অতএব একজন সাথী সেই চরিত্রে গড়ে ওঠে তার বন্ধু যে চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত আছে। যদি সে সত্যবাদী এবং মুখলিছ হয়, তাহলে তার বন্ধুও তাই হবে। আর যদি সে আহলে রিয়া হয় তাহলে তার বন্ধুও তাই হবে। এই কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ المِسْكِ وَنَافِخِ الكِيرِ فَحَامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً.

'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হল, কস্তুরী ওয়ালা ও কামারের হাপরের ন্যায়। কস্তুরী ওয়ালা হয়ত তোমাকে কিছু দান করবে কিংবা তুমি তার নিকট হতে কিছু খরিদ করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি সুবাস পাবে। আর কামারের হাপর হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দিবে কিংবা তুমি তার নিকট হতে দুর্গন্ধ পাবে'।[৪৫]

উক্ত হাদীছে যে সাথীর মাধ্যমে ইহকাল এবং পরকালের উপকার সাধিত হয় তার সহচর গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে। পক্ষন্তারে যে সাথীর মাধ্যমে উভয় কালের ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে তার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।[৪৬]

৯. মুখলিছদের অনুসরণ করা :

ইখলাছ অর্জনের অধিকতর সহজ উপায় হচ্ছে মুখলিছদের অনুসরণ করা এবং তাদের পন্থায় চলা। যেহেতু সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মুখলিছদের জীবন চরিত বর্ণনা করা অতি উত্তম পন্থা, কেননা সে পন্থায় পূর্ববর্তী সালাফগণ তাদের কর্মে সাফল্য

৩৯. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ২২২।
৪০. তিরমিযী হা/২৫১৬, সনদ ছহীহ।
৪১. বুখারী হা/৬৪৯৯।
৪২. ফাৎহুল বারী ১১/৩৪৪।
৪৩. তুহ্ফাতুল আহওয়াযী ৯/৪৯ পৃঃ।
৪৪. মুসনাদে আহমাদ হা/৮৩৯৮; মিশকাত হা/৫০১৯, সনদ ছহীহ।
৪৫. বুখারী হা/৫৫৩৪; মিশকাত হা/৫০১০।
৪৬. ফাৎহুল বারী ৪/৩৮০ পৃঃ।

অর্জন করেছেন। অতএব উত্তম আদর্শ, যা অন্তরে জেগে উঠে মূল্যবোধ ও ভালবাসা এবং জীবনের পূর্ণতা। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা নবীগণের আদর্শ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ৩৩/২১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ 'তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথের অনুসরণ কর' *(আন'আম ৬/৯০)*। قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ 'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(মুমতাহানা ৬০/৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ 'তোমাদের উপর কর্তব্য হচ্ছে আমার সুন্নাত ও হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে অনুসরণ করা, তা মাড়ির দাঁত দিয়ে আকড়ে ধরা'।[৪৭]

আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, ওলামাদের সম্পর্কে বর্ণনা করা এবং তাদের সাথে উঠা-বসা করা আমার নিকট অধিক প্রিয় ফিকহ চর্চা করার চেয়ে। কেননা তা জাতির শিষ্টাচার ও চরিত্র'।[৪৮]

অতএব যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের এবং তাদের অনুসারীদের জীবন চরিতের দিকে দৃষ্টি দিলে ইখলাছের নমুনা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়, যা জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে এবং ঈমানের অগ্নিশিখাকে প্রজ্বলিত করে।

১০. ইখলাছ হবে মুখ্য উদ্দেশ্য :

ইখলাছের ফযীলত হৃদয়ে। অনেকে মুখলিছ হতে উৎসাহী। কিন্তু মুখলিছ ব্যক্তির সংখ্যা অতি নগণ্য। এর কারণ মূলতঃ তাদের সে উৎসাহটা ইখলাছ টার্গেট করে নয়। যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে মুখলিছ হতে চায় তাহলে সর্বদা সে প্রত্যেকটি কাজে ইখলাছ অনুসরণ করে চলবে এবং উদ্দেশ্য ইখলাছ ছাড়া অন্য কিছু রাখবে না। আর কখনো মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করা ঠিক নয়। মানুষের প্রত্যেকটি কাজ হবে পরকালকে সামনে রেখে, তা যেন দুনিয়ার স্বার্থে, মানুষের প্রশংসার আশায় না হয়।

قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصه وأصوبه فقيل له: يا أبا علي! مأخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، و إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص: أن يكون لله، والصواب: أن يكون على السنة–

ফুযাইল ইবনু ইয়ায (রহঃ) لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا সম্পর্কে বলেন, 'প্রত্যেক কাজ একনিষ্ঠতা ও বিশুদ্ধতার সাথে কর। তাকে বলা হল, হে আবু আলী! একনিষ্ঠতা ও বিশুদ্ধতা কী? তিনি বলেন, যখন আমল সঠিক হয় কিন্তু ইখলাছ থাকে না, তখন তা গৃহীত হয় না। আবার যখন ইখলাছ থাকে কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে আদায় হয় না, তখন তাও গৃহীত হয় না যতক্ষণ ইখলাছ এবং সঠিক পদ্ধতি দু'টি না থাকবে। ইখলাছ হচ্ছে, যা আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়। আর সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, যা সুন্নাহ মোতাবেক করা হয়'।[৪৯]

ইবনু শাহীন (রহঃ) সাঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন,

لايقبل قول إلا بعمل ولايقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقه السنة–

'আল্লাহ্‌র নিকট কোন কথাই গ্রহণ করা হয় না আমল ব্যতীত; কোন কথা এবং আমল গ্রহণ করা হয় না নিয়ত ব্যতীত। আর কোন কথা, আমল বা নিয়তও গ্রহণযোগ্য করা হয় না সুন্নাত মোতাবেক হওয়া ব্যতীত'।[৫০] মানব জীবনের প্রত্যেকটি কর্ম লিল্লাহ হওয়া একান্ত কর্তব্য। কেননা যে কর্ম লিল্লাহ হয় না তা অনোপকারী এবং অস্থায়ী। আর যদি লিল্লাহ হয় তাহলে তা উপকারী ও চিরস্থায়ী হয়।[৫১]

মুখলিছ ব্যক্তির নিদর্শনাবলী

১. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা :

মুখলিছ ব্যক্তিদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তারা তাদের আমলের বিনিময়ে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করে। তারা এর বিনিময়ে পার্থিব জীবনের কোন সুযোগ, সম্মান, প্রশংসা ও সম্পদ কামনা করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 'তুমি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবে তাদেরই সঙ্গে যারা সকাল ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে' *(কাহাফ ১৮/২৮)*। হাদীছে এসেছে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসল এবং বলল, একজন ব্যক্তি গণিমতের মালের আশায় যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে উপদেশ পালনের জন্য এবং আর একজন ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। সুতরাং (তাদের মধ্যে) কে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করল? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করল, সেই আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করল'।[৫২] অতএব মুখলিছগণ বিশুদ্ধ নিয়তের

---

৪৭. আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫, সনদ ছহীহ।

৪৮. জামেউল বায়ান ওয়া ফাযালিহি ১/৫০৯ পৃঃ।

৪৯. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইস্তিক্বামাহ ২/৩০৮-৯ পৃঃ।

৫০. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইস্তিক্বামাহ ২/৩০৯ পৃঃ।

৫১. জামে' আল-মাসায়েল ৬/১০৯পৃঃ।

৫২. বুখারী হা/২৮১০; মুসলিম হা/৫০২৮; মিশকাত হা/৩৮১৪।

অধিকারী। তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তার দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব চায়।

২. নির্জনে আমলে আসক্তি :

আল্লাহ্র মুখলিছ বান্দাগণ তাদের সৎ আমলগুলো সর্বদা গোপন রাখতে অধিক ভালবাসে। সা'দ (রাঃ) কর্তৃক মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ 'নিশ্চয় আল্লাহ ঐ বান্দাকে ভালবাসেন যে বান্দা ধর্মভীরু, মুখাপেক্ষাহীন ও আত্মগোপনকারী'।[৫৩]

এটিই ছিল সালাফে-ছালেহীনদের বৈশিষ্ট্য। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হল :

(ক) ইবনু মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি তাঁর বাড়ি থেকে বের হলেন। তাঁর পিছনে একটি দল তার অনুসরণ করল। অতঃপর তিনি তাদের দিকে লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, তোমরা কী জন্য আমার অনুসরণ করলে? আল্লাহ্র শপথ! যদি তোমরা জানতে যে বস্তুর উপর আমার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তাহলে তোমাদের দু'জন ব্যক্তিও আমার অনুসরণ করত না'।[৫৪]

(খ) ওমর ইবনু খাত্তাব (রা) মদীনার এক প্রান্তে জনৈক বৃদ্ধা অন্ধ মহিলার রাত্রি বেলা দেখাশুনা করতেন। তার জন্য পানি সংগ্রহ করতেন এবং অন্য কাজগুলো করে দিতেন। এক সময় তিনি সে মহিলার বাড়িতে এসে দেখেন যে কেউ তার সব কাজ করে চলে গেছে। অতঃপর পূর্বে তিনি তার নিকট পুনরায় আসেন, যাতে তাঁর পূর্বে কেউ না আসতে পারে এবং তিনি তার প্রতীক্ষায় থাকেন যে, সে ব্যক্তি কে? অতঃপর কিছুক্ষণ পর দেখে তিনি আবুবকর (রাঃ)। সে সময় তিনি প্রথম খলীফা। অতঃপর ওমর (রাঃ) বললেন, হায় আফসোস! সেই ব্যক্তি আপনি।[৫৫]

(গ) মানছূর আস-সুলামী চল্লিশ বছর যাবত ছিয়াম ও ক্বিয়াম পালন করেছেন। তিনি আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করতেন। অতঃপর তার মা তাকে বলল, হে প্রিয় বৎস! তুমি একটি আত্মা হত্যা করেছ? অতঃপর তিনি বললেন, আমার আত্মার ব্যাপারে আমি অধিক জ্ঞাত আমি কি করেছি। যখন সকাল হত তখন তিনি চোখে সুরমা লাগাতেন, মাথায় তৈল ব্যবহার করতেন এবং তার ঠোঁটদ্বয় উজ্জ্বল করতেন; তারপর মানুষের নিকট গমন করতেন।[৫৬]

(ঘ) দাঊদ ইবনু হিন্দ তিনিও চল্লিশ বছর যাবত ছিয়াম পালন করতেন, যা তার পরিবার জানত না। তিনি একজন বয়নশিল্পী ছিলেন। সকাল বেলা তার বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার নিয়ে তার কর্মস্থলে রওয়ানা হতেন। অতঃপর পথিমধ্যে সে খাবার ছাদাক্বাহ করে দিতেন এবং সন্ধা বেলা বাড়িতে এসে তাদের সাথে ইফতার করতেন।[৫৭]

(ঙ) জয়নুল আবদীন আলী ইবনু হুসাইন, তিনি মদীনার একশত পরিবারের খরচ বহন করতেন। তিনি রাত্রিবেলায় তাদের বাড়িতে এসে খাবার পৌঁছে দিতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তারা জানত না যে, কে তাদেরকে খাবার দেয়। অতঃপর তিনি যখন মারা যান তাদের খাবার আসা বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা বুঝতে পারলেন তিনি হলেন সেই ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যুর সময় তারা তাঁর পিঠে খাবার বহন করার দাগ দেখতে পেয়েছিল, যে খাবার তিনি বিধবাদের বাড়িতে পৌঁছাতেন।[৫৮]

(চ) সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন, আমি এমন ব্যক্তিদের সন্ধান লাভ করেছি, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে একই বালিশে ঘুমাত। সে আল্লাহ্র ভয়ে ক্রন্দন করত অথচ তার স্ত্রী টের পেত না। আর আমি এমন কিছ লোক পেয়েছি যারা একই কাতারে ছালাত আদায় করত এবং তাদের অশ্রু ঝরত অথচ তার পার্শ্বের ব্যক্তি বুঝতে পারত না।[৫৯]

(ছ) হাসান ইবনু সেনানের স্ত্রী বলেন, (আমার স্বামী) তিনি আমার বিছানায় আসতেন এবং আমার চাদরের ভিতরে প্রবেশ করতেন। অতঃপর তিনি আমাকে বোকা বানাতেন যেমনভাবে মহিলা তার ছোট বাচ্চাকে বোকা বানিয়ে থাকে। যখন বুঝতেন যে, আমি ঘুমিয়ে গেছি, তখন তিনি গোপনে বের হয়ে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর আমি তাকে বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি আপনার আত্মাকে আর কত কষ্ট দিবেন, আপনি আপনার আত্মার প্রতি সদয় হন। তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক তুমি চুপ কর! হতে পারে ঘুমিয়ে গেলে আর সজাগ পাব না।[৬০]

(ছ) ইবনুল মুবারক যুদ্ধের ময়দানে তার আস্তিন মুখের উপর রাখতেন, যাতে তাঁকে কেউ চিনতে না পারে।[৬১]

সুধী পাঠক! এই গোপনীয় আমলগুলো থেকে বুঝা যায় যে, নির্জনে, গোপনে আমল করা যরূরী। তবে এটা নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফরয নয়।

কুরতুবী (রহঃ) বলেন, সমস্ত নফল ইবাদত গোপনে করাই উত্তম রিয়া থেকে মুক্ত থাকার জন্য। ফরযের ক্ষেত্রে এমনটি নয়। তবে আহলুল ইলমগণ ঐ ইবাদতের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছেন, যা দেখে মানুষ অনুসরণ করে; সে ক্ষেত্রে প্রকাশ করা ভালো। তাবারী (রহঃ) বলেন, ইবনু মাসঊদ, ইবনু ওমর এবং কতিপয় সালাফগণ তারা তাদের মসজিদে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতেন। আর তারা তাদের আমলের সৌন্দর্য প্রকাশ করতেন এই উদ্দেশ্যে, যাতে তাদের অনুসরণ করা হয়।[৬২]

৩. মুখলিছ ব্যক্তির প্রকাশ্য আমলের চেয়ে গোপনীয় আমল অধিক সুন্দর :

সে মুখলিছ নয়, যে মানুষের সামনে নিজের ইবাদত প্রকাশ করে। ইবনু আত্বা বলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল যে ইবাদতে সর্বদা নিজের মনের তদারকী করা হয়।[৬৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا 'তারা রাত্রি অতিবাহিত

৫৩. মুসলিম হা/২৯৬৫; মিশকাত হা/৫২৮৪।
৫৪. মুখতাছার মিনহাজুল ক্বাসিদীন, পৃঃ ২০৯।
৫৫. তারিখুল খোলাফা, পৃঃ ৭৫।
৫৬. সিয়ারু 'আলামিন নুবালা ৫/৪০৬ পৃঃ।
৫৭. হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/৯৪ পৃঃ।
৫৮. সিয়ারু 'আলামিন নুবালা ৩/৩৯৩ ও ৯৪ পৃঃ।
৫৯. হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৪৭ পৃঃ।
৬০. হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/১১৭ পৃঃ।
৬১. সিয়ারু 'আলামিন নুবালা ৮/৩৯৪ পৃঃ।
৬২. ফাৎহুল বারী ১১/৩৪৫ পৃঃ।
৬৩. ইহইয়া উলূমুদ্দীন ৪/৩৯৭ পৃঃ।

করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত ও দণ্ডায়মান হয়ে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৪)*। ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. قَالَ ثَوْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا.

'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা ক্বিয়ামতের দিন তেহামার শুভ্র পর্বতমালার সমতুল্য নেক আমল সহ উপস্থিত হবে। আল্লাহ তা'আলা সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। ছাওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলায় তোমাদের মতই ইবাদত করে। কিন্তু তারা এমন লোক যে, তারা একান্ত গোপনে আল্লাহ্র হারাম কৃত বিষয়ে লিপ্ত হবে'।[৬৪] অতএব গোপনে হারাম ও গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া অতীব জঘন্য অপরাধ, যা মুখলিছদের বৈশিষ্ট্য নয়।

হামীদুত তাবীল বলেন, যখন তুমি নির্জনে আল্লাহ্র নাফরমানী করবে তখন তুমি এই বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি তোমাকে প্রত্যক্ষ করছেন এবং তুমি বড় অপরাধ করে ফেলেছ।[৬৫] বেলাল ইবনু সাঈদ বলেন, যে গোপনে আল্লাহ্র শত্রুতা করে সে তাঁর প্রকাশ্যে বন্ধু হতে পারে না।[৬৬]

৪. আমল বর্জন হওয়ার ভয়ে শঙ্কিত হওয়া :

যখনই মুখলিছ বান্দার আমল বেশী হতে থাকে তখন সে তার আমল বর্জন এবং কবুল না হওয়ার ভয়ে শঙ্কিত থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ 'যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এই বিশ্বাসে যে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীতি-কম্পিত হৃদয়ে' *(মুমিনূন ২৩/৬০)*।

হাসান বছরী (রহঃ) তাদের সম্পর্কে বলেন, তাদেরকে ইখলাছ দেয়া হয়েছে অথচ তারা তাদের আমল গ্রহণ হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে।[৬৭] হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ قَالَتْ عَائِشَةُ أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ لاَ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لاَ تُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ.

'নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রী আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম এই আয়াতটি সম্পর্কে, 'তারা তো ঐ সকল লোক, যারা দান করে তা হতে যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে আর তাদের অন্তর (আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে) ভীত'। আয়েশা (রাঃ) বললেন, তারা কি ঐ সব লোক যারা মদ পান করে ও চুরি করে (অথচ আল্লাহকে ভয় করে)? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে ছিদ্দীকের কন্যা! না, তারা নয়। তবে তারা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা ছিয়াম রাখে, ছালাত আদায় করে, ছাদাক্বাহ করে এবং তারা ভয় করে যে, তাদের পক্ষ হতে তা গ্রহণ করা হবে না এবং তারা কল্যাণের ব্যাপারে দ্রুত ধাপিত হয়'।[৬৮]

ইমাম মাওয়ার্দি বিভিন্ন বিষয়ের একজন বিখ্যাত লেখক। যেমন আল-হাবীল কাবীর, আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন, আহকামুস সুলতানিয়াহ এবং আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্দীন; তাঁর এই সমস্ত লিখিত গ্রন্থাবলী তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ হয়নি। এগুলো তিনি একটি স্থানে একত্রিত করে রেখেছিলেন। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল তিনি তার এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বললেন, আমার কিছু লিখিত কিতাব অমুক জায়গাতে আছে যেগুলো আমি প্রকাশ করিনি আমার বিশুদ্ধ নিয়তের আশায়।[৬৯] সুবহানাল্লাহ।

৫. মানুষের প্রশংসার আশা না করা :

তারা সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করলে, তাদের থেকে দুঃখ-কষ্ট দূর করলে এবং চিন্তা লাঘব করলে তারা কারো প্রতি কোন মর্যাদার আশা পোষণ করে না। কেননা তারা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমল করে থাকে। আল্লাহ বলেন, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ 'আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে' *(শু'আরা ২৬/১০৯)*।

তাদের প্রতি কেউ খারাপ আচরণ করলে তারা তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে না। কোন কিছু থেকে তাদের বাধা দিলে তারা তার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ করে না। আর সৃষ্টির কারো নিকট থেকে তারা প্রতিদান বা পুরস্কারের আশা করে না। তাদের অবস্থা হলো এমন যা স্বয়ং আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا 'কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়' *(দাহর ৭৬/০৯)*।

পরিশেষে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মুসলিম তার জীবনের যাবতীয় ইবাদত সম্পাদনের মৌলিক বিষয় হল ইখলাছ। ইখলাছ ছাড়া কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না। তাছাড়া ইখলাছ ছাড়া কোন আমল কবুল হয় না। তাই সকলকে ইখলাছ অর্জনের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা যরূরী। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন-আমীন!!

---

৬৪. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫০৫, সনদ ছহীহ।
৬৫. ইহইয়া উলূমুদ্দীন ৪/৩৯৭ পৃঃ।
৬৬. শিফাতুন নেফার লিল ফিরাযাযী, পৃঃ ৯৭।
৬৭. জামেউল আহকামুল কুরআন ১২/১৩২ পৃঃ।
৬৮. তিরমিযী হা/৩১৭৫; মিশকাত হা/৫৩৫০, সনদ ছহীহ।
৬৯. সিয়ারু 'আলামিন নুবালা ১৮/৬৬-৬৭ পৃঃ।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার মৌলিক কর্তব্য

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকা :

ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা *(কাহাফ ১৮/৪৬)*। তবে এগুলো ফেৎনার কারণও বটে *(আনফাল ৮/২৮)*। ধন সম্পত্তির সঠিক ব্যবহার মানুষকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছায়। অনুরূপ এর অপব্যবহার লাঞ্ছনা-প্রবঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার সন্তান-সন্ততি যেমন পিতা-মাতাকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌঁছায়, তেমনি সন্তানদের অপকর্মের কারণে পিতা-মাতাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও বিব্রতও হতে হয়। প্রত্যেক পিতা-মাতারই কামনা থাকে তাদের সন্তান আদর্শ হোক। তবে কামনার বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই পিতা-মাতাকে শারঈ মানদণ্ডে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সন্তানদের লালন-পালন করতে হবে। নিম্নে একজন সন্তানকে আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতার যে মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তা উল্লেখ উল্লেখ করা হল।

মূলের সন্ধানে :

পিতা-মাতার মাধ্যমে সন্তানরা এই পৃথিবীতে আসে। আর তাদের সাহচর্যে বেড়ে ওঠে। এ কারণেই সন্তানরা তাদের পিতা-মাতার আদর্শে আদর্শিত হয়। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক সন্তানই ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী অথবা নাছারা কিংবা অগ্নিপূজক বানায়।[৭০]

সন্তানদের আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য রয়েছে পিতা-মাতার নানাবিধ কর্তব্য। প্রথমতঃ পিতা-মাতাকেই আদর্শের মূর্তপ্রতিক হতে হবে। তবেই উত্তম চরিত্রের সন্তান পাওয়া সম্ভব।

(ক) জন্মপূর্ববর্তী করণীয় :

সুসন্তান পেতে হলে একজন যুবকের সর্বপ্রথম করণীয় হল পুণ্যবতী নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা। আর পুণ্যবতী নারীকে বিবাহ করা সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা সুস্পষ্ট। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা মহিলাদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ কর। তার সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বীন। অতঃপর তোমরা দ্বীনদার মহিলাদের প্রাধান্য দিবে।[৭১] অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পূণ্যবতী নারী সম্পর্কে বলেছেন, إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ 'দুনিয়ার সমস্ত বস্তুই ভোগ্যবস্তু। আর উত্তম ভোগ্যবস্তু হল নেককার নারী'।[৭২] এজন্যই নেপোলিয়ান বলেছেন, Give me a educated mother I shall give you a good nation. 'তোমরা আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দিব'।

বিবাহকালীন দো'আ পাঠ করা :

(ক) বাসর রাতে স্ত্রীর চুলের অগ্রভাগ ধরে নিম্নোক্ত দো'আ পড়তে হবে।

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট থেকে তার মঙ্গল এবং যে মঙ্গল তার মধ্যে দিয়েছেন তা চাচ্ছি এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার অনিষ্ঠ এবং তার মধ্যকার অনিষ্ঠ থেকে'।[৭৩]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী সহবাসের সময় নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করে তাহলে সন্তান জন্ম নেওয়ার সময় সন্তান শয়তানের আঁচড় থেকে রক্ষা পাবে।

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

'আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের শয়তান থেকে মুক্ত রাখুন এবং আপনি যা দান করবেন তাকেও শয়তান থেকে মুক্ত রাখুন'।[৭৪]

আল্লাহ্‌র নিকট সুসন্তান কামনা করা :

প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত আল্লাহ্‌র নিকট সৎকর্মশীল সন্তান প্রার্থনা করা। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মুসলিমরা সন্তানের জন্য পীর-ফকীর-দরবেশ-মুর্শিদ কিংবা মাযারে যায়। সেখানে গিয়ে বিভিন্ন নযর নেওয়াজ পেশ করে, যা স্পষ্ট শিরক। কেননা সন্তান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর সন্তান চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই। ইবরাহীম (আঃ) ও যাকারিয়া (আঃ)-এর আল্লাহ্‌র দরবারে সন্তানের প্রার্থনা ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা কথা। ৮০ বছর বয়সে ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সৎসন্তান দান করুন' *(ছাফ্‌ফাত ৩৯/১০০)*। আবার অতি বৃদ্ধাবস্থায় যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এভাবে,

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا- وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا.

'তিনি বলেছিলেন, হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হয়েছে। বার্ধক্যে আমার মাথার চুল সাদা হয়েছে। হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করে আমি কখনই ব্যর্থ হইনি। আমি ভয় করি আমার উত্তরাধিকারীত্বের। আমার স্ত্রী বন্ধা। সুতরাং তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী' *(মারইয়াম ১৯/৩-৪)*।

উল্লেখ্য যে, দো'আ চাওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে একক গণ্য করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ

৭০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০।
৭১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮২।
৭২. মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩।
৭৩ . আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৬।
৭৪ . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪১৬।

اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ‘যখন তোমরা কোন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ্র নিকট চাইবে। আর যখন কোন কিছু প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহ্র নিকটেই প্রার্থনা করবে’।[৭৫]

দো‘আর সুফল :

(ক) বার্ধক্যের শেষ সীমায় ইবরাহীম (আঃ) অতিক্রম করছিলেন, আর তার স্ত্রী হাজেরাও ছিলেন একজন বয়স্কা নারী। এহেন পরিস্থিতিতে ইবরাহীম (আঃ)-এর দো‘আর বরকতে তাকে এমন সুসন্তান দান করলেন, যার সহনশীলতার স্বীকৃতি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে। তিনি হলেন ইসমাঈল (আঃ)। তার সহনশীলতার সার্টিফিকেট স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ‘অতঃপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম’ *(ছাফ্ফাত ৩৭/১০২)*। অতঃপর তিনি পরবর্তীতে নবী হলেন এবং তাঁর বংশেই বিশ্ব জগতকে আলো করে আগমন করেন আমাদের প্রিয়নবী বিশ্বনবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। যার আগমনে বাতিল শক্তি হয়েছিল পর্যুদস্ত। সত্য হয়েছিল বিজিত। মানবতা উপহার পেয়েছিল শান্তির সমাজ।

(খ) অনুরূপ যাকারিয়া (আঃ)-এর যখন বার্ধক্যের সমস্ত আলামত প্রকাশ পেয়েছিল এবং তাঁর স্ত্রীও তখন বার্ধক্যের দোরগোড়ায় তখন তাদের দো‘আর সুফল হিসাবে বন্ধ্যা হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ এক ব্যতিক্রম সন্তান দান করলেন, যিনি পরবর্তীতে নবী হয়েছিলেন এবং যার নামে ইতিপূর্বে কোন নবী আসেননি। আল্লাহ বলেন, يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ‘হে যাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া। আর এই নামে আমি ইতিপূর্বে কারো নামকরণ করিনি’ *(মারইয়াম ১৯/৭)*।

(খ) জন্মপরবর্তী করণীয় :

তাহনীক ও সুন্দর নাম চয়ন :

যখন সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তখন তাকে তাহনীক করানো সুন্নাত। তাহনীক হল সন্তান জন্মের পর কোন মুত্তাক্বী ব্যক্তির নিকট থেকে খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কোন বস্তু চিবিয়ে শিশুর মুখে দেয়া। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي مُوسَى رضى الله عنه قَالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَىَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى.

আবু মূসা (রাঃ) বলেন, আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মালে আমি তাকে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম। তারপর খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দো‘আ করে আমার নিকট ফিরিয়ে দিলেন। সে ছিল আবু মূসার সব চেয়ে বড় ছেলে।[৭৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের নাম সমূহের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।[৭৭] অতএব সন্তানদের উত্তম ও অর্থবোধক নাম রাখতে হবে।

আক্বীক্বা ও খাৎনা :

আক্বীকা করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى ‘সন্তানের সাথে আক্বীক্বা জড়িত। অতএব তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্ট দূর কর’।[৭৮] অর্থাৎ তার জন্য একটি আক্বীক্বার পশু যবেহ কর এবং তার মাথার চুল ফেলে দাও। অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى ‘প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, নাম রাখতে হয় ও তার মাথা মুণ্ডণ করতে হয়’।[৭৯] তিনি আরো বলেন, عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لاَ يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا ‘ছাগ হৌক বা ছাগী হৌক ছেলের পক্ষ থেকে দু’টি ও মেয়ের পক্ষ থেকে একটি আক্বীক্বা দিতে হয়’।[৮০] পুত্র সন্তানের জন্য দু’টি দেওয়াই উত্তম। তবে সামর্থ্য না থাকলে একটি দিলেও চলবে।[৮১]

খাৎনা মূলতঃ নবীগণের সুন্নাত এবং নিঃসন্দেহে এটি চিরন্তন মানবীয় সভ্যতার পরিচায়ক। খাৎনা করার মধ্যে যে অফুরন্ত কল্যাণ রয়েছে সে বিষয়ে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীগণ সকলে একমত। শিশুকালে খাৎনা করার কারণে বয়সকালে ঐ ব্যক্তি অসংখ্য অজানা রোগ থেকে বেঁচে যায়। ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে আল্লাহ্র নির্দেশে নিজেই নিজের খাৎনা করেছিলেন।[৮২] সুতরাং শিশুর নাম রাখা যেমন যরূরী তেমনী শিশুকালেই তার খাৎনা করা যরূরী। কেননা খাৎনা হল ফিৎরাত ও নবীগণের সুন্নাত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, পাঁচটি বিষয় মানুষের স্বভাবজাত। যথা- খাৎনা করা, নাভির নীচের লোম ছাফ করা, গোঁফ ছাটা, নখ কাটা ও বগলের লোম ছাফ করা।[৮৩]

ছালাতের নির্দেশ প্রদান :

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলিমদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। ছালাত শুধু নিজে আদায় করলে চলবে না। সকলকে নিয়েই আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারের প্রধানকে সচেতন থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ‘তোমার পরিবারবর্গকে ছালাতের আদেশ দাও ও তাতে অবিচল থাক’ *(ত্বহা ২০/১৩২)*

---

৭৫ . মুসতাদরাক হাকেম হা/৬৩০৩।
৭৬. বুখারী হ/৫৪৬৭।
৭৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫২।
৭৮. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৪৯।
৭৯. আবুদাঊদ হা/২৮৩৯; মুয়াত্ত্বা হা/৬৫৪।
৮০. নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪১৫২।
৮১. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৫।
৮২. বুখারী হা/৩৩৫৬ ও ৬২৯৭।
৮৩. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২০।

সুধী পাঠক! সোনামণিদের ৭ বছর বয়সেই ছালাতে অভ্যস্ত করতে হবে। তবে ১০ বছর বয়সে পুরোপুরি অভ্যস্ত না হলে তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ.

আমর ইবনু শু‘আয়ব (রাঃ) তিনি তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা থেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন ৭ বছর হবে, তখন তাদেরকে ছালাত আদায়ের জন্য আদেশ দাও। আর ১০ বছরে পদার্পণ করলে ছালাতের জন্য প্রহার কর এবং তাদের শয্যা পৃথক করে দাও।[৮৪]

অতএব সন্তানকে ১০ বছর বয়সেই নিয়মিত ছালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান করে গড়ে তুলতে হবে। এতে একটি শিশু যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা ছালাত মানুষকে যাবতীয় পাপ কাজ থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ‘নিশ্চয় ছালাত যাবতীয় খারাপ ও গর্হিত কাজ থেকে রক্ষা করে’ *(‘আনকাবূত ২৯/৪৫)*।

সন্তান ছালাত আদায়কারী হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা :

প্রতিটি পরিবারের কর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল। উক্ত দায়িত্ব সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। কর্তা যেমন নিজে ছালাত আদায় করবে, তেমনি পরিবারের সকল সদস্যকে ছালাত আদায়ের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিবে এবং তারা যেন নিয়মিত ছালাত আদায়কারী হয় সে জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করবে। যেভাবে ইবরাহীম (আঃ) দো‘আ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ছালাত আদায়কারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যে হইতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর’ *(ইবরাহীম ১৪/৪০)*। সুতরাং সন্তান যাতে ছালাত আদায় করে সেজন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করতে হবে। সন্তানরা ছালাত পড়লে খুবই ভাল, না পড়লে শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং আল্লাহ্র নিকট দো‘আ করতে হবে।

সৎ-উপদেশ প্রদান :

আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে বলছেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ‘তুমি উপদেশ দিতে থাক, নিশ্চয় উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে’ *(যারিয়াত ৫১/৫৫)*। উপদেশ মানুষের মনে প্রভাব ফেলে। সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের ভাল মন্দ সহ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপদেশ দিতে হবে। এমন কাজই পিতা হিসাবে ইবরাহীম, ইয়াকুব ও লুকমান (আঃ) করে দেখিয়েছেন। ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আঃ) তাদের সন্তানদের উপদেশ দিতেন এভাবে, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ‘আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় সন্তানদের সদুপদেশ প্রদান করেছিলেন, হে আমার বংশধর! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য এই (জীবন ব্যবস্থা) দ্বীন মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না’ *(বাক্বারাহ ২/১৩২)*। লুকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ‘স্মরণ করুন, যখন লুকমান উপদেশ দিয়ে তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, হে প্রিয় পুত্র! আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক মহা যুলুম’ *(লুকমান ৩১/১৩)*।

তবে প্রতিনিয়ত উপদেশ দিলে তার প্রভাব থাকবে না। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِى الأَيَّامِ كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا ‘নবী কারীম (ছাঃ) আমাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্দিষ্ট দিনে উপদেশ প্রদান করতেন, যাতে আমরা বিরক্তবোধ না করি’।[৮৫]

ভাল কাজের আদেশ ও তার সুফলতা বর্ণনা করা :

সন্তানদের সর্বদা ভাল কাজের আদেশ দিতে হবে। সাথে সাথে ভাল কাজের মর্যাদা এবং এর সুফলতা বর্ণনা করলে সন্তানরা সে দিকেই উৎসাহী হবে। যেমন লুকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে ছালাত আদায়, ভাল কাজ করা এবং মন্দ থেকে নিষেধের পরপরই ধৈর্যধারণের সফলতার কথাও বলেছেন। আল্লাহ বলেন, يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ‘হে প্রিয় বৎস! ছালাত কায়েম করবে, ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করবে। নিশ্চয় এটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ’ *(লুকমান ৩১/১৭)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ‘নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*।

মন্দ কাজের নিষেধ ও তার সুফলতা বর্ণনা করা :

মন্দ কাজ যে খারাপ, অন্যায়ের ভয়াবহ পরিণতি, মন্দ কাজে সামাজিক পদস্খলন, অপমান, অপদস্তের মত দুনিয়াবী শাস্তি আর পরকালীন জীবনের চিরন্তন শাস্তির কথা সন্তানকে শোনাতে হবে। লুকমান (আঃ) তাঁর সন্তানের উপদেশ দিয়ে বলেন, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ‘তুমি অহংকারবশতঃ মানুষ হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ কর না। কারণ আল্লাহ কোন অহংকারীকে পসন্দ করেন না’ *(লুকমান ৩১/১৮)*। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِى وَالْعَظَمَةُ إِزَارِى فَمَنْ نَازَعَنِى وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ ‘অহংকার আমার চাদর, বড়ত্ব আমার লুঙ্গী। এদু’টির কোন একটি কেউ গ্রহণ করলে আমি তাকে জাহান্নামে দিব’।[৮৬]

সন্তানদের অপরাধে লঘু শাস্তি প্রদান :

সন্তানকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য যেমন তাকে ভালবাসতে হবে, তেমনি তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও রাখতে হবে। মানুষ কখনই নিয়মতান্ত্রিকভাবে চলতে চায় না। শয়তানের কুমন্ত্রণা মানুষকে সর্বদা খারাপ কাজ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। তবুও সন্তানকে প্রত্যেক বিষয়ের বিশুদ্ধ নিয়মগুলো শিক্ষা দিতে হবে। মু‘আয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে অছিয়ত করলেন, وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَباً وَأَخِفْهُمْ فِى اللَّهِ ‘তুমি তোমার উপার্জিত সম্পদ তোমার পরিবারের উপর সামর্থ্য অনুসারে ব্যয় কর।

৮৪. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭২, সনদ ছহীহ।

৮৫. বুখারী হা/৬৮ ও ৬৪১১।
৮৬. আবুদাঊদ হা/৪০৯০; মিশকাত হা/৫১১০, সনদ ছহীহ।

পরিবার-পরিজনকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার লাঠি তুলে রেখ না। আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে পরিবারের লোকজনকে ভীতি প্রদর্শন কর'।[৮৭]

সুধী পাঠক! সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে লাঠির প্রয়োজন হতে পারে। এমনকি প্রাপ্ত বয়সেও শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা একদা এক সফর থেকে আসছিলাম। এমতাবস্থায় রাস্তায় আমার হার হারিয়ে যায়। হার খুঁজতে গিয়ে ছালাতের সময় হয়ে গেল। তখন আমাদের নিকট পানি ছিল না। আর সেখানে কোন পানির ব্যবস্থাও ছিল না। জনগণ আমার আব্বার নিকট গিয়ে বলল, আপনি জানেন আপনার মেয়ে কি অসুবিধা ঘটিয়েছে? এ খবর শুনে আমার আব্বা রাগান্বিত হয়ে আমার নিকট আসলেন এবং আমার কোমরের উপর এত জোরে কিল মারলেন যদি আমার স্বামী মুহাম্মাদ (ছাঃ) আমার উরুর উপর মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে না থাকতেন, তাহলে প্রহারের কারণে আমি সরে যেতাম।[৮৮] আলোচ্য ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পিতা মাতা সন্তানদের যে কোন বয়সে শাস্তি দেয়ার অধিকার রাখেন।

মারাত্মক অপরাধে কঠোর শাস্তি না দিয়ে ধৈর্যধারণ করা :

সন্তানদের মাধ্যমে কখনও এমন অপরাধ ঘটে যেতে পারে, যা মারাত্মক। এমতাবস্থায় অভিভাবক যদি জিদ ধরে রাখেন তাহলে অপরাধ আরো বেড়ে যেতে পারে। শয়তান তাদের ঘাড়ে আরো চেপে বসতে পারে। এহেন অবস্থায় তাদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করে ধৈর্যধারণ করতে হবে। ইয়াকূব (আঃ)-এর সাথে তাঁর সন্তানের ব্যাপারে এমনই আচরণ করা হয়েছিল। যখন ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাকে কুয়ায় নিক্ষেপ করে জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে পিতা ইয়াকূব (আঃ)-এর নিকট উপস্থিত করলে তিনি ধৈর্যধারণ করেন। অতঃপর তিনি এ বিষয়টি আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করেন। আল্লাহ বলেন, وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 'তারা যখন ইউসুফ (আঃ)-এর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। তখন ইয়াকূব (আঃ) বললেন, এটা কখনই নয়, বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল' *(ইউসুফ ১২/১৮)*।

সন্তান প্রতিপালনে সতর্কতা ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করা :

সন্তান-সন্ততি হল পিতা-মাতার নয়নের ধন। পিতা-মাতা সন্তানের ভালবাসা আর মঙ্গলের জন্য যে কোন প্রকারের কাজ করতে দ্বিধাবোধ করে না; এমনকি আদরের সন্তানের জন্য তাদের জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ হয় না। তথাপি তাদের প্রতি অধিক ভালবাসা আর মোহে খারাপ কাজ যাতে না হয় এজন্য অধিক পরিমাণে সর্তক থাকতে হবে। পক্ষান্তরে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বাবা-মা সন্তানের অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়ার অধিকার রাখেন। তবে এর পরিমাণ কখনও কঠিন কখনও হালকা আবার কোন ক্ষেত্রে ক্ষমাসুলভ হতে হবে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'হে মুমিনগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর এবং ক্ষমা কর তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়' *(তাগাবুন ৬৪/১৪)*।

সন্তানদের পরামর্শ গ্রহণ :

সন্তানদের ব্যাপারে কোন বিষয়ে কাজ করার পূর্বে তাদের পরামর্শ নিতে হবে। এ বিষয়ে তার কোন আগ্রহ বা আপত্তি আছে কি-না তা জানতে হবে। তাহলে সে শয়তানের গোপন ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাবে এবং কাজটি সফলভাব সম্পন্ন করা যাবে। এমন দৃষ্টান্ত ঘটেছিল পিতা-পুত্র ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর মধ্যে। ইসমাঈল (আঃ) ১৩/১৪ বছর বয়সে পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার উপযুক্ত হলে আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-কে স্বপ্ন দেখালেন যে, তিনি তাঁর নয়নের মণি ইসমাঈলকে কুরবানী করছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পুত্রকে তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন এবং পুত্রের অভিমত জানতে চাইলেন। পুত্র তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ.

'যখন ইসমাঈল পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম তাকে বললেন, হে আমার বেটা! বল তোমার অভিমত কি? সে বলল, হে পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে আপনি তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চান তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন' *(ছাফ্ফাত ৩৭/১০২)*।

সুধী পাঠক! পিতা ও পুত্রের বিশ্বাসগত সমন্বয় বা অভিমত ব্যতীত কুরবানীর উক্ত গৌরবময় ইতিহাস রচিত হত না। ইসমাঈল যদি পিতার অবাধ্য হতেন এবং দৌড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন তাহলে আল্লাহ্র হুকুম পালন করা ইবরাহীমের পক্ষে আদৌ সম্ভব হত না। সুতরাং পিতা-পুত্রের অভিমত আদান-প্রদান এবং তাদের দৃঢ়চিত্ততায় আল্লাহ খুশি হয়ে ইসলামের ইতিহাসে কুরবানীর রেওয়ায ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি করে দিলেন।[৮৯]

সন্তানদের সঠিক প্রস্তাব মেনে নেয়া এবং তা বাস্তবায়ন করা :

সন্তান যদি কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে তা মেনে নিতে হবে। যেমন ছাগল ও শস্য মালিকের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসায় পুত্র সুলায়মান (আঃ)-এর প্রস্তাব পিতা দাঊদ (আঃ) গ্রহণ করেন ও তার নিজের দেওয়া রায় বাতিল করে পুত্র সুলায়মানের পরামর্শ অনুযায়ী রায় দেন ও তা কার্যকর করেন।

ইমাম বাগাভী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদাহ ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা দু'জন লোক দাঊদ (আঃ)-এর নিকটে একটি বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসে। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্য ক্ষেতের মালিক। শস্যক্ষেতের মালিক ছাগপালের মালিকের নিকট দাবী পেশ করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই। সম্ভবতঃ শস্যের মূল্য ও ছাগলের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে দাঊদ (আঃ) শস্যক্ষেতের মালিককে তার নষ্ট ফসলের বিনিময় মূল্য হিসাবে পুরা ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিতে বললেন।

---

৮৭. মুসনাদে আহমাদ হা/২২১২৮; মিশকাত হা/৬১, সনদ হাসান।
৮৮. বুখারী ১/৪৮ পৃঃ, হা/৩৩৪।
৮৯. নবীদের কাহিনী ১/১৩৭-১৪০ পৃঃ।

বাদী ও বিবাদী উভয়ে বাদশাহ দাঊদ (আঃ)-এর আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে পুত্র সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সব খুলে বলে। তিনি পিতা দাঊদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হত। অতঃপর পিতার নির্দেশে তিনি বললেন, ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে সাময়িকভাবে দিয়ে দেওয়া হৌক। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক। পক্ষান্তরে শস্যক্ষেতটি ছাগপালের মালিককে অর্পণ করা হৌক। সে তাতে শস্য উৎপাদন করুক। অতঃপর শস্যক্ষেত যখন ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তা ক্ষেতের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ছাগপাল তার মালিককে ফেরৎ দেওয়া হবে'। দাঊদ (আঃ) রায়টি অধিক উত্তম গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন। এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন,

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

'স্মরণ করুন, দাঊদ ও সুলায়মানকে, যখন তারা একটি শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করেছিল, যাতে রাত্রিকালে কারু মেষপাল ঢুকে পড়েছিল। আর তাদের বিচারকার্য আমাদের সম্মুখেই হচ্ছিল। অতঃপর আমরা সুলায়মানকে মোকদ্দমাটির ফায়ছালা বুঝিয়ে দিলাম এবং আমরা উভয়কে প্রজ্ঞা জ্ঞান দান করেছিলাম' *(আম্বিয়া ২১/৭৮-৭৯)*।

সন্তানদের কথা শোনা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা :

কবির ভাষায় 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। আজকের সোনামণিরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের ছোট ছোট কথাগুলো আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্নের বৃত্তান্ত পিতা ইয়াকুব (আঃ)-কে শোনালে তিনি তা শ্রবণ করেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন। আল্লাহ বলেন,

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ

'যখন ইউসুফ পিতাকে বলল, পিতা আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে। সূর্য এবং চন্দ্রকে। আমি তাদের আমার উদ্দেশ্যে সেজদা করতে দেখেছি। তিনি বললেন, বৎস তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(ইউসুফ ১২/৪-৫)*।

সন্তানদের আদর্শ শিক্ষা দেওয়া :

শিক্ষা প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার। সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পিতা-মাতার। আমরা জানি আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম রক্ষা করতে হলে আদর্শ শিক্ষা ছাড়া কোনই পথ নেই। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি সাধন করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আঃ) মারফত মহানবী (ছাঃ)-কে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন। তারপরই তো তিনি আল্লাহ্র একত্বের প্রচার শুরু করেছেন। আর তার উপর প্রত্যাদেশকৃত প্রথম শব্দই ছিল اِقْرَأْ 'পড়ুন'। সুতরাং পড়া বা শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব বর্ণনায় বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ 'ইলম অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয'।[৯০] অতএব সন্তানদের আদর্শ শিক্ষা দেয়া পিতা-মাতার একান্ত যরূরী।

শারঈ বিষয়ে সন্তানদের প্রাধান্য না দেওয়া :

সন্তানের প্রতি ভালবাসার কারণে অনেক সময় মানুষ শারঈ বিষয়ের উপরে তাদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আল্লাহ্র দয়া, ক্ষমা, অনুগ্রহ, অনুকম্পা আর তাঁর ভালবাসা পেতে ইলাহী হুকুম পালন আর মহানবী (ছাঃ)-এর অনুসরণই একমাত্র পথ। আর মুমিন হওয়ার অন্যতম গুণাবলী হল সবার চেয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে প্রাধান্য দেওয়া। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা প্রাণাধিক সন্তান-সন্ততি কিংবা দুনিয়ার অন্যকোন প্রিয় ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ আমাকে তার পিতা-মাতা সন্তান-সন্ততি এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চেয়ে ভাল না বাসবে।[৯১]

সন্তানদের বিবাহ পরবর্তী পিতা-মাতার কর্তব্য :

অনেক পিতা-মাতা মনে করেন সন্তানের বিয়ে দিতে পারলে দায়িত্ব শেষ। বাস্তবে কিন্তু তা নয়; বরং সন্তানদের বিবাহের পরও তাদের মঙ্গলের জন্য সর্বদা দিক নির্দেশনা দিতে হবে। তাদের বৈবাহিক জীবনে কোন অমঙ্গল লক্ষ্য করলে সে বিষয়ে সতর্ক করতে হবে। যেমনটা ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-কে করেছিলেন।[৯২]

কন্যা সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতার মর্যাদা :

সমাজে নারীরা অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। তারা নানাবিধ বৈষম্যের শিকার। কন্যা সন্তান জন্ম নিলেই পিতা-মাতার মুখ মলিন হয়ে যায়। তারা কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্রকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ কন্যা সন্তান লালন-পালনের মর্যাদা পুত্রের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। বরং বেশী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি কন্যাদের ব্যাপারে সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, তাহলে এই কন্যাগণ তার জাহান্নামের অন্তরাল হবে'।[৯৩]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ 'যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা সন্তানকে বালেগ হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, আমি ও সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন এভাবে একত্র থাকব। এই বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে ধরলেন'।[৯৪]

পরিশেষে আমরা দো'আ করি, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতিটি পরিবারে সুসন্তান দান করুন-আমীন!!

[লেখক : সহ পরিচালক, সোনামণি, রাজশাহী মহানগর ও ছাত্র, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী কলেজ]

---

৯০. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; মিশকাত হা/২১৮, সনদ হাসান।
৯১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭।
৯২. বুখারী হা/৩৩৬৪।
৯৩. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৪, সনদ ছহীহ।
৯৪. মুসলিম হা/৬৮৬৪; তিরমিযী হা/১৯১৪।

প্রসঙ্গ : হলুদ সাংবাদিকতা ও ইহূদীদের বিশ্ব মিডিয়া কব্জা

-মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বর্তমান সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের অবস্থা :

প্রায় শতবর্ষ আগে জনৈক রাষ্ট্রনায়ক বলেছিলেন, 'তাকে যদি সংবাদপত্রবিহীন সরকার এবং সরকারবিহীন সংবাদপত্র এ দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে বলা হত, তাহলে অবশ্যই দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সরকারবিহীন সংবাদপত্রকেই বেছে নিতেন'। তার কাছে সংবাদপত্র ছাড়া রাষ্ট্র বা সমাজ কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব। পরবর্তী শত বছরে দুনিয়ার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন মতামতেরও উদ্ভব হয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় দু'হাযারেরও অধিক পত্রিকা রয়েছে। এর মধ্যে বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা প্রায় শতাধিক; যেলাওয়ারী দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা পাঁচ শতাধিক; সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ষাণ্মাসিক পত্রিকার সংখ্যা দু'শতাধিক, ম্যাগাজিন সংখ্যা অর্ধশতাধিক, অনলাইন পত্রিকার সংখ্যা পাঁচ শতাধিক।[৯৫]

প্রথমতঃ সমগ্র বাংলাদেশ থেকে এখন যেসব দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, যদিও এর মধ্যে অধিকাংশই বলতে গেলে নাম-গোত্রহীন। এগুলো প্রকাশিত হয় প্রকাশক-সম্পাদকের নিছক আয়ের উৎস হিসাবে। কিছু বিজ্ঞাপন ছাপা, কিছু লোককে ভয় দেখিয়ে বা ব্ল্যাকমেলিং করে অর্থ আদায় করা এবং প্রকাশক-সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব ও ভাব বৃদ্ধিজনিত ইগো পরিতৃপ্তিই হচ্ছে এসব তথাকথিত পত্রিকা প্রকাশের ভিত্তি। এরকম তাৎপর্যহীন সাপ্তাহিক পত্রিকাও আছে সম্ভবত সহস্রাধিক। পত্রিকার সবচেয়ে বড় বিষয় তার প্রচার বা সার্কুলেশন। অনুমিত হয় যে, ঢাকা থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পত্রিকাসমূহের সম্মিলিত সার্কুলেশনই এখন প্রায় ২০ লাখেরও অধিক। এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও নিয়মিত পত্রিকা পড়ে। এক একটি পত্রিকার পাঠক যদি ৫ জনও হয়ে থাকে, তাহলেও বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি মানুষ প্রতিদিন পত্রিকা পড়ে। বাংলাদেশের পাঠাক্ষম মানুষের প্রতি ৬ জনের একজন অবশ্যই নিয়মিত বা অনিয়মিত পত্রিকা পড়ে থাকে।[৯৬]

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে নাগরিকগণের চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। আর তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা গেলে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী ও বিদেশী অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারী সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়, দুর্নীতি হ্রাস পায় ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তথ্য অধিকার আইনের ১০ ধারার আলোকে তথ্য সরবরাহের জন্য ৩১ আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত সারাদেশে সরকারী পর্যায়ে ১৫,৮০০ জন এবং এনজিও পর্যায়ে ৩৭১৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১১,৫৩৩ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং ৮৯৩ জন সাংবাদিক ও সাব-এডিটরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরও বিস্তৃত করতে ২৫ হাযার ওয়েবসাইড নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন'; বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪১টি বেসরকারী চ্যানেল, ২৪টি এফএম রেডিও এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও বর্তমান বাংলাদেশে চালু আছে।[৯৭]

ইংরেজীতে বলা হয়, Pen is mighter than the Sword অর্থাৎ 'অসির চেয়ে মসির শক্তি বেশি'। অসির ধ্বংস করার ক্ষমতা নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু মসি যখন ক্ষুরধার হয়ে ওঠে, তখন সেই বিধ্বংসী শক্তির পরাজয় ঘটে। তবে মসি যতদিন কার্যকর ভুমিকা গ্রহণ না করে, ততদিন অসির দাপট ও দৌরাত্ম্য সীমাহীন। এটা সাধারণভাবে যেমন সত্য, তেমনি ক্ষুরধার পরিসরেও প্রযোজ্য। সত্য সংবাদ মাধ্যমের ক্ষেত্রেও ম্যাসলাইন মিডিয়ার (এমসি) এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০০৬ সালে সারাদেশে সাংবাদিক নির্যাতনের ১৮৬টি ঘটনা ঘটেছে। উল্লেখিত ঘটনায় মোট ৪৭১ জন সাংবাদিক বিভিন্নভাবে নাজেহাল হন। বিগত ৪ দলীয় ঐক্যজোট সরকারের আমলে মন্ত্রী ও সরকারী কর্মকর্তাদের হাতে সাংবাদিক হেনস্থা হন ১৪১ জন অর্থাৎ নির্যাতন পরিসংখ্যানের এক-তৃতীয়াংশ।[৯৮]

সুধী পাঠক! আমাদের বিকাশমান গণমাধ্যম শিল্প এখন হাযার কোটি টাকার লগ্নি করার ক্ষেত্র। তাই সাংবাদিকতা বিকৃতি নয়, বরং শিল্পীর রূপ পাবে। এতকিছুর পরও গণমাধ্যমই হল মানুষের শেষ ভরসা। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মুক্ত সাংবাদিকতা, নিরাপত্তার পাশাপাশি গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল ভূমিকা এখন মানুষের প্রত্যাশা।[৯৯]

বিশ্বমিডিয়ায় সত্য প্রকাশে সাহসী ভূমিকা :

(এক) মার্কিন তরুণ এডওয়ার্ড স্নোডেন (জন্ম ২১ জুন ১৯৮৩) : যুক্তরাষ্ট্রের 'জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা'র (এনএসএ) গোপন নযরদারী কার্যক্রম সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ অতিগোপনীয় তথ্য জনসমক্ষে ফাঁস করে দিলে ২০১৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বজুড়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পেন্টাগণ এটিকে আমেরিকার ইতিহাসে 'মহাবিপর্যকর' তথ্য ফাঁসের ঘটনা বলে বর্ণনা করে।

এনএসএ বিভিন্ন রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি নাগরিকের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের ওপর গোপনে নযরদারী করে থাকে ইন্টারনেট ও মোবাইল টেলিফোন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্রের আইনসহ আন্তর্জাতিক সব আইনকানুন ও রীতিনীতির পরিপন্থী 'এনএসএ'-এর এই গণগোয়েন্দাগীরির তথ্য বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি যুক্তরাজ্যের 'গার্ডিয়ান' ও যুক্তরাষ্ট্রের 'ওয়াশিংটন পোস্ট' এই দু'টি সংবাদপত্রকে এনএসএ-এর 'টপ সিক্রেট' তথ্যভাণ্ডারের ইলেকট্রনিক ভাষ্য হস্তান্তর করলে পত্রিকা দু'টি সেসবের ভিত্তিতে প্রামাণ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করা শুরু করে। তার ফাঁস করা তথ্য থেকে জানা যায়, মার্কিন এনএসএ জার্মান চ্যান্সেলর আঞ্জেলা মার্কেল, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট দিলমা রুসেফসহ বিশ্বের অন্তত ৪০টি

৯৫. বাংলাদেশের সংবাদপত্রের অনলাইন তালিকা ।
৯৬. দৈনিক ইনকিলাব, ৪ জুন ২০০৬, পৃঃ ৩৪ ।
৯৭. দৈনিক আমাদের সময়, রোববার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃঃ ৫ ।
৯৮. দৈনিক সমকাল, মঙ্গলবার, ১৭ জুলাই ২০০৭, পৃঃ ৪ ।
৯৯. দৈনিক বর্তমান, সোমবার, ৭ জুলাই ২০১৪, পৃঃ ৪ ।

দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের মোবাইল ফোনে আড়ি পেতেছে। চীনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা ও গবেষণা নেটওয়ার্কে নযরদারী হয়েছে। আড়ি পাতা হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নাগরিক ও ইইউর কর্মকর্তাদের ওপর। নযরদারীর টার্গেট করা ৩৮টি দূতাবাস ও মিশনের মধ্যে ছিল ওয়াশিংটনে ইইউর দূতাবাস ও নিউইয়র্ক মিশন। এক মাসের মধ্যেই আড়ি পেতে রেকর্ড করা হয়েছে স্পেনের নাগরিকদের ছয় কোটি ফোনকল।[১০০]

(দুই) লিকস লর্ড জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ (জন্ম ৩ জুলাই ১৯৭১, অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে) : যিনি বিশ্বব্যাপী সাড়া জাগানো ইন্টারনেট সাইবার 'উইকিলিকস্'-এর প্রতিষ্ঠাতা। ব্যক্তি জীবনে তিনি হ্যাকার, প্রোগ্রামার এবং সাংবাদিক। ২০০৬ সালে তার প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হলেও ২০১০ সালে প্রায় ১২ লাখ আমেরিকান গোপন নথিপত্র প্রকাশের পর সবার নযরে আসে।[১০১]

(তিন) ব্রাডলি ম্যানিং (জন্ম ১৭ ডিসেম্বর ১৯৮৭, ওকলাহামা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) : যিনি পেশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা সদস্য। ইরাক যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য পেয়েছেন 'ক্যাম্পেইন মেডেল'। তিনি সাড়া জাগানো উইকিলিকস্কে লাখ লাখ মার্কিন গোপন নথি সরবরাহে সাহায্য করেন। তিনি বলেন, তথ্য ছাড়া তুমি জানতে পারবে না সরকার কী করছে। মূলতঃ বিবেকের তাড়না থেকে গোপন নথি ফাঁস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।[১০২]

(চার) ডেনিয়েল এলস্বার্গ : যিনি পেশায় একজন সামরিক বিশ্লেষক। ১৯৭১ সালে পেন্টাগণের ৭০০০ পৃষ্ঠার গোপন দলীল ফাঁস করে দিয়েছিলেন নিউইয়র্ক টাইমসে। যেখানে ভিয়েতনাম যুদ্ধ বিষয়ক এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল। অতি স্পর্শকাতর দলীল সূত্রে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন প্রেসিডেন্টসহ শীর্ষ রাজনীতিকরা আগেই জানতেন যে, ভিয়েতনাম যুদ্ধে জয় অসম্ভব। সরকার কংগ্রেস ও জনগণের কাছে মিথ্যা বলেছে যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে।[১০৩]

(পাঁচ) মার্ক ফেল্ট (১৯১৩-২০০৮) : যিনি 'এফবিআই'-এর সহযোগী পরিচালক ছিলেন। ২০০৫ সালে তিনি হৈচৈ ফেলে দেন এ কথা বলে যে, তিনিই ছিলেন ১৯৭২ সালের ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির বহুল আলোচিত 'ডিপ থ্রোট'। তিনি ওয়াশিংটন পত্রিকার প্রতিবেদক কার্ল বের্নস্টেইন ও বব উডওয়ার্ডকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। যার পরিণতিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ১৯৭৪ সালে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।[১০৪]

(ছয়) ফ্রেডরিক হোয়াইটহাস্ট : যিনি 'এফবিআই'-এর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ওয়াশিংটন পোস্টকে গোয়েন্দা সংস্থা 'এফবিআই'-এর নিয়োগ পদ্ধতিতে অযোগ্য লোক, ক্রাইম ল্যাবে ভয়াবহ অনিয়ম আর অসততা বিশেষ করে গুরুতর সব মামলা ত্রুটিপূর্ণ এবং অবৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ ব্যবহার করেন, তার মধ্যে আছে দুনিয়া কাপানো 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বম্বিং' (৯/১১) ও 'ওকলাহোমা সিটি বিস্ফোরণ' মামলার তথ্যগুলো দেন। ফলে ১৯৯৭ সালে এর কিছুটা স্বচ্ছতা ফিরে আসে।[১০৫]

(সাত) মোরদেশাই ভানুন : যিনি পেমায় ইসরাঈলের পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের একজন টেকনিশিয়ান। একটি ব্রিটিশ পত্রিকায় তার ফাঁস করে দেয়া অতিগোপনীয় তথ্যসূত্রে দুনিয়া প্রথমবারের মত জেনে যায় ইসরাঈল পরমাণু বোমার বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। এ তথ্য ফাঁস করার পর ১৯৮৬ সালে ইসরাঈলের আদালত তাকে ১৮ বছরের কারাদণ্ড দেন।[১০৬]

(আট) পিটার বাক্সটন : যিনি পেমায় ছিলেন একজন গণস্বাস্থ্য অধিদফতরের কর্মকর্তা। ১৯৭২ সালে একদিন তিনি গবেষণা কাজ চালানোর জন্য জানতে পারেন, গবেষণা কাজ চালানোর জন্য সরকার গরীব রোগীদের পরীক্ষামূলক ওষুধ সরবরাহ করছে। খবরটা সংবাদপত্রে প্রকাশের পর মানুষ জানতে পারে যে, ৪০ বছর ধরে মার্কিন সরকার মানুষকে গিনিপিগ বানিয়েছে।[১০৭]

(নয়) জোসেফ উইলসন : যিনি মার্কিন সরকারের অ্যাম্বাসেডর। ২০০৩ সালে তিনি নিউইয়র্ক টাইমসে এক প্রবন্ধে প্রেসিডেন্ট বুশের ইরাক আক্রমণের যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তার স্ত্রী ভ্যালেরি উইলসন একজন 'সিআইএ'-এর গোপন প্রতিবেদক। পরে তিনি সিআইএ থেকে পদত্যাগ করেন।[১০৮]

(দশ) জ্যা ডার্বি : যিনি পেশায় ছিলেন মার্কিন সৈনিক। তিনি ইরাকের আবু গারীব কারাগারে বন্দিদের ওপর মার্কিন সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের হৃদয়বিদারক দৃশ্যের কিছু ছবি ২০০৪ সালে মিডিয়াতে প্রকাশ করেন।[১০৯]

ইহূদীদের বিশ্ব মিডিয়া কব্জা :

টিভি, রেডিও, চলচ্চিত্র, মঞ্চ নাটক, সংবাদপত্র, পুরা ইন্টারনেট জগৎ এখন ইহূদী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এরা তারাই, যারা নির্ধারণ করে কোন্ মিডিয়ায় কোন্ ধরনের সংবাদ, রিপোর্ট, ছবি, ফিচার ইত্যাদি প্রকাশিত হবে। কার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। কাকে প্রচুর সুবিধা দিতে হবে। এরা তারাই, যারা এই সিদ্ধান্ত দেয় যে, আফগানিস্তানে ৫০ হাযার লোকের তুলনায় আমেরিকার চিড়িয়াখানায় অসুস্থ সেই ৫টি পাণ্ডা অধিকতর মূল্যবান। তাদের মিডিয়ার বদৌলতে ও কলমের কারিশমায় বা ইলেকট্রনিক্স যাদুর কৃতিত্বে পরের দিন সারা বিশ্ব পাণ্ডা জরে আক্রান্ত। তারা যদি আজ এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, মিনি স্কাট সারা বিশ্বের পোশাক হওয়া চাই। তো অল্প দিনেই সারা বিশ্বের মানুষকে আপনি স্কাট পরে ঘুরতে দেখবেন।

বিল মাহের ছিলেন মার্কিন মুল্লুকের একজন বিখ্যাত অভিনেতা। তিনি টিভিতে রম্য অনুষ্ঠান উপস্থাপন করতেন। ৮০টি রাষ্ট্রের অসংখ্য দর্শক-শ্রোতা তার অনুষ্ঠান উপভোগ করত বিপুল আগ্রহে। ২০০২ সালের আগস্ট মাসে টিভিতে একটি রম্য অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেছিলেন। যাতে আফগানিস্তানে মার্কিন হামলায় বিপর্যস্ত নাগরিকদের কল্প চিত্র ফুটে ওঠে। কৌতুকটি উপস্থাপনের পর তিনি ঘরে ফিরে যান। সেই যে তিনি ঘরে ফিরলেন তার পক্ষে আর কোন দিন টিভি পর্দার সামনে আসা

১০০. দৈনিক প্রথম আলো, বুধবার, ১ জানুয়ারী ২০১৪, পৃঃ ২।
১০১. www.wikileaks.org, দৈনিক বর্তমান, রবিবার, ১০ নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ৯।
১০২. দৈনিক বর্তমান, ১০ নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ৯।
১০৩. দৈনিক বর্তমান, ১০ নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ৯।
১০৪. দৈনিক বর্তমান, ০৪ নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ৯।
১০৫. সিএনএন, দৈনিক বর্তমান, ৪ নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ১১।
১০৬. দৈনিক বর্তমান, ৪ নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ১১।
১০৭. দৈনিক বর্তমান, ১০ নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ৯।
১০৮. দৈনিক বর্তমান, ১০ নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ৯।
১০৯. টাইম ম্যাগাজিন, দৈনিক বর্তমান, ১০ নভেম্বর ২০১৩, পৃঃ ৯।

সম্ভব হয়নি। তার বাসায় অবস্থানকালীন 'ডিজনী কোম্পানী' তার বহিষ্কার পত্র ঘরে পাঠিয়ে দেয়। এরপর তিনি অসংখ্য চ্যানেলে চাকুরীর জন্য আবেদন করেন। দীর্ঘদিন ধরনা দিয়েছেন তাদের দ্বারে দ্বারে, কিন্তু কেউ তাকে চাকুরী দেয়ার ঝুঁকি নেয়নি। বিল মাহের মার্কিন মিডিয়া জগতের চেহারা উন্মোচন করে দিয়েছেন। এটাই তার অপরাধ।

২০০২ সালের এ্যাডওয়ার্ডের অনুষ্ঠান উপস্থাপক কোন অভিনেতার নাম বলার পূর্বেই ইহূদীদের সম্পর্কে একটি কৌতুক বলা শুরু করলেন। কথার মাঝামাঝি এসেছেন এমন সময় সকল টিভির পর্দায় শুরু হয়ে গেল ভয়ংকর বিভীষিকা। সমগ্র দুনিয়ায় তাবৎ টিভি চ্যানেলগুলো একযোগে বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর টিভি পর্দা পুনরায় আলোকিত হয়ে উঠল। তখন টিভি পর্দার সামনে হাযির নতুন উপস্থাপক। এ ঘটনার পর সেই প্রথম উপস্থাপককে আর কোন দিন টিভির পর্দায় দেখা যায়নি।

ধর্মহীন কমিউনিস্ট ও পাশ্চাত্যের এক শ্রেণীর কট্টর মুসলিমবিদ্বেষীদের হাতে এর ব্যবহার। ইন্ডিয়ার কিছু মিডিয়ারও একই আচরণ। জার্মানীর নাৎসি সরকারের প্রচারমন্ত্রী পল যোসেফ গোয়েবলস বলতেন যে, বারবার বললে সত্য মিথ্যায়, আর মিথ্যা সত্যে পর্যবসিত হয়। এই পল যোসেফ গোয়েবলস্ (১৮৯৭-১৯৪৫) ১৫ জুন, ১৯৩৯ সালে এথেনস শহরে এক ভাষণে বলেছিলেন, 'আমরা তো প্রচার-প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে রাইখ (পার্লামেন্ট) গঠন করেছি'। গোয়েবলস স্বীকার করেছেন যে, তাদের পার্লামেন্ট নির্বাচনের সাফল্যের কারণ প্রচার-প্রপাগাণ্ডা। হিটলারের নাৎসি পার্টি ক্যু করে ক্ষমতায় যায়নি। তার মিথ্যা প্রচারনা ও যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টি করে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল। মিডিয়াকে তারা সন্ত্রাসীর মত ব্যবহার করেছিল। তাদের নেতা এডলফ্ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) তার কুখ্যাত 'মেইন ক্যাম্প' বইয়ে বলেছেন, 'সব প্রচার-প্রপাগাণ্ডা হতে হবে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে কম বুদ্ধিমান, যাদেরকে লক্ষ্য করে এটা চালানো হয়, তাদের বোধগম্য হতে হবে'।[১১০] তিনি একই বইয়ে বললেন, যেইমাত্র এই প্রচার-প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে বিক্ষোভের সামান্যতম সত্যকে স্বীকার করা হয়, তাহলে নিজের ব্যাপারে সন্দেহের বীজ-বপন করা হল।[১১১] রবার্ট স্টারলিং লিখলেন যে, আজ যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র ৬টি কোম্পানী প্রায় সব গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলো হল, টাইম ওয়ার্নার, ডিসনে, বার্টেলসম্যান, ফক্স, ডাইয়াকম ও জেনারেল ইলেকট্রিক। এসব কোম্পানী আবার একে অন্যের শেয়ার।

১৯৮৩ থেকে ১৯৯২-তে মিডিয়া দৈত্যের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে চৌদ্দতে নেমে যায়। ফেডারেশন কমিউনিকেশনস্ কমিশনের একজন স্পষ্ট সদস্য 'কমিশনার মাইকেল কপ' বলেছিলেন, 'মার্কিন মিডিয়ার উপর কালো মেঘ ভর করছে'। এদিকে ক্লিয়ার চ্যানেল কমিউনিকেশনস নামে একটি রেডিও দৈত্যের আবির্ভাব হয়, যারা বারোশ'য়ের বেশী রেডিও স্টেশন নিয়ন্ত্রণে নেয়; অথচ ১৯৯৬ সালের টেলিকম ডিরেগুলশন এর পূর্বে কোন কোম্পানীকে চল্লিশটির বেশী স্টেশন দেওয়া হত না। এই ক্লিয়ার চ্যানেল কোম্পানী রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক। তারা সারাদেশে ইরাক যুদ্ধের পক্ষে তথাকথিত 'প্যাট্রিয়াটিক র‍্যালি' করে বুশকে সমর্থন দেয়। এসব তথ্য মিডিয়াতে দক্ষিণপন্থী নিয়ন্ত্রণ ফাঁস করে। যদিও বলা হয়, মিডিয়াতে লিবারেল রায়াস রয়েছে। দক্ষিণপন্থী মিডিয়ার অন্যতম হল- ফক্স, ওয়াশিংটন টাইমস, ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল এন্ড টকরেডিও প্রভৃতি। তারা টকরেডিওতে মিথ্যাচার করে, মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাদের বিকল্প নেই।[১১২] এদিকে পাশ্চাত্য, ইসরাঈলী ও ভারতীয় মিডিয়া মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে সমানে মিথ্যাচার করে চলেছে। পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় মুসলিমদের যে জঘন্যভাবে মিডিয়াতে দেখে, তার অন্যতম কারণ হল নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ। জার্মান নব্য মুসলিম ও সাবেক রাষ্টদূত মুরাদ উইলফ্রেড হফম্যান বলেন, 'ঐতিহাসিকভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের মনে যে শত্রুতা রয়েছে, তার মূলে রয়েছে এই ধারণা যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) একজন ভণ্ড ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। খ্রীষ্টানদের চোখে মুসলিমদের শত্রু হিসাবে দেখার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল'।[১১৩] মুরাদ হফম্যান বলেন, 'বসনিয়াতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সার্বিয়াদের ধ্বংসযজ্ঞকে তাই সার্বিয় এবং গ্রীক সংবাদ মাধ্যমে উভয়েই ক্রুসেড আখ্যায়িত করে স্বাগত জানিয়েছে এই বলে যে, এই ধর্মযুদ্ধের মাধ্যমে অতঃপর ইউরোপের মাটি থেকে শেষ মুসলিমকে উৎখাত করা যাবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, পৃথিবীর মঞ্চে ধর্মীয় যুদ্ধের পুনরুত্থান ঘটেছে।[১১৪] আর বসনিয়াই এর শেষ নয়।[১১৫]

মুহাম্মাদ শাহাদত হুসাইন নাদভীর লিখিত 'পশ্চিমা মিডিয়া এবং ইহূদীবাদ' নামক এক প্রবন্ধে বলেন, সুইজারল্যান্ডের 'বাযিল' নগরীতে অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ ইহূদী সাংবাদিক ড. থিওডোর হার্জেলের নেতৃত্বে ১৮৯৭ সালের ২৯ ও ৩০ আগস্ট 'বিশ্ব ইহূদী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ৩০টি ইহূদী সংগঠনের প্রায় ৩০০ জন ইহূদী নেতা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে যে পরিকল্পনা তৈরি করে তা ২৪ প্রটোকল আকারে প্রণীত হয় এবং জনৈক খ্রীস্টান মহিলা সেই ২৪ প্রটোকলের একটি কপি চুরি করে দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করে দেয়। তারই কিছু অংশ, 'সংবাদপত্র তথা সকল প্রচার মাধ্যমের অসাধারণ গুরুত্ব, প্রভাব ও ভূমিকার কথা উল্লেখ করে ১২ নং প্রটোকলে উল্লেখ করা হয়, যদি আমরা ইহূদীরা পুরো বিশ্বকে শোষণ করার পূর্বশর্ত হিসাবে দুনিয়ার সকল পুঁজি কুক্ষিগত করাকে প্রধান কর্তব্য মনে করি, তবে প্রচার মিডিয়া আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দ্বিতীয় প্রধান ভূমিকা পালন করবে। আমরা মিডিয়ার অবাধ্য ঘোড়ায় চড়ে তার বাগডোর শক্তহাতে ধারণ করে রাখব। আমাদের শত্রুদের পক্ষ হতে এমন কোন শক্তিশালী সংবাদপত্র প্রকাশ হতে দেব না, যার মাধ্যমে তারা তাদের মতামত জনগণের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তাদের সে সুযোগই আমরা দেব না যে, তারা আমাদের অগোচরে কোন সংবাদ সমাজের কাছে পৌঁছে দেবে। আমরা এমন আইন প্রণয়ন করব যে, আমাদের অনুমোদন ছাড়া কোন প্রকাশনা সংস্থার পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক ছাপাতে পারবে না। এমনিভাবে আমাদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরণের প্রোপাগাণ্ডা ও চক্রান্ত সহজভাবেই আমরা ধরে ফেলতে পারব। আমাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যেসব সংবাদপত্র, বই-পুস্তক বের হবে তা বিভিন্ন দল ও পার্টিকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাবে, যদিও সে দলগুলো হয়

১১০. পরিচ্ছেদ ৬, পৃষ্ঠা-২৩২।
১১১. পৃষ্ঠা, ২৩৭ ।
১১২. রবার্ট স্টারলিং, পৃষ্ঠা ১৬১-১৬৩।
১১৩. ইসলাম ২০০০, পৃঃ ২৫ ।
১১৪. কারেন আর্মস্ট্রর 'হলি ওয়ার' দি ক্রুসেডস এন্ড দেয়ার ইমপ্যাক্ট অন টুডেস ওয়ার্ল্ড, নিউইয়র্ক ১৯৮৮ ।
১১৫. হফম্যান, পৃঃ ২৮, দৈনিক ইনকিলাব, রবিবার, ০৪ জুন ২০০৬, পৃঃ ৩১।

বিপরীতমুখী ও একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এমনকি আমরা যেসব পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করব, সেগুলো সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, নীতি বিবর্জিত, যৌন আবেদনশীল হবে এবং অপরাধ জগতের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরার মধ্য দিয়ে যুব সমাজের নৈতিক চরিত্রের চরম অবক্ষয় ঘটাবে এবং সাথে সাথে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে যেতে থাকবে। কখনও একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী সরকারকে পূর্ণ সমর্থন জোগাবে। আবার কখনো তারই বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহী করে তুলবে এবং ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে সে সরকার পতন ঘটিয়ে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করবে।

আমরা যখন যে দেশে ইচ্ছা করবো, সেখানকার জনগণের আবেগ-অনুভূতিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জাগিয়ে তুলব, আবার প্রয়োজনবোধে আমরা মিথ্যা সংবাদের আশ্রয় নেব ও সত্য-মিথ্যা সব ধরনের খবর পরিবেশন করব। আমরা এমন আধুনিক, নবতর পদ্ধতিতে, মার্জিত ভাষায় ও জাদুকরী পন্থায় খবর পরিবেশন করব যে, দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ও সরকার তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করবে এবং সত্য-মিথ্যা যাচাই করার আদৌ প্রয়োজন আছে বলে মনে করবে না। আমরা যে কোন সংবাদ দেয়ার ক্ষেত্রে খুবই সতকর্তা অবলম্বন করব এবং প্রথমে সমাজের মন-মানসিকতা ভালভাবেই যাচাই করে দেখব যে, কোন ধরনের সংবাদ তারা সহজে গ্রহণ করে। অর্থাৎ সমাজদেহের নাড়ি পরীক্ষা করে তদনুযায়ী ইনজেকশন পুশ করব।

আমাদের সংবাদপত্র হিন্দুদের বিষ্ণুর মত হবে, যার শতাধিক হাত থাকে। আমাদের প্রেসের প্রধান দায়িত্ব হল, বিভিন্ন বিষয়ে কলাম লেখে জনমত যাচাই করা। আমরা ইহূদীরা যেসব সম্পাদক সাংবাদিকদের প্রচুর উৎসাহ জোগাবে, যারা নীতিভ্রষ্ট এবং তাদের রীতিমত অপরাধ রেকর্ড হয়েছে, তেমনি দুনিয়ার কুখ্যাত লম্পট, রাজনৈতিক লিডার, কূটনীতিবিদ ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের সাথেও আমরা একই ধরনের ব্যবহার করব, তাদের খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেব এবং দুনিয়ার সামনে তাদের হিরো হিসাবে তুলে ধরব। অতঃপর তাদের দিয়েই আমাদের কাজ সমাধা ও স্বার্থ উদ্ধার করে নেব। কিন্তু যখন দেখব যে, তাদের কেউ কেউ আমাদের নিয়ন্ত্রণের গণ্ডি হতে বেরিয়ে যাচ্ছে বা যেতে চাচ্ছে, তৎক্ষণাৎ তাকে যেকোনভাবে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব। এমনিভাবে যে সকল রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের চক্রান্ত বুঝতে পেরে আমাদের বিরুদ্ধে লেগে যাবে, তাদের ধরাপৃষ্ঠ হতে নিশ্চিহ্ন করে দেব। যাতে অন্যদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ হতে থাকে। ইহূদীদের প্রটোকলে আরো উল্লেখ আছে, আমরা ইহূদীরা দুনিয়ার সকল আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমগুলো সংবাদ সংস্থাসমূহের মাধ্যমে কন্ট্রোল করব, যাতে করে দুনিয়াবাসীকে আমরা যে চিত্র দেখাতে চাই, সে চিত্রই দেখবে। অপরাধ জগতের খবরগুলো আমরা এমন সূক্ষ্মভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরব, যাতে পাঠকদের ব্রেন ওয়াশ হয়ে উল্টো অপরাধীদের প্রতিই তারাই সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।[১১৬]

পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ মিডিয়া ফার্ম :

পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ মিডিয়া ফার্ম মোট ৫টি। যথা- (১) ওয়ালেট ডিজনী (২) টাইম ওয়ানার (৩) ভায়াকম বা প্যারামাউন্ট (৪) নিউজ কালেকশান (৫) জাপানের SONY. এই সংবাদ কোম্পানীগুলো সবই ইহূদী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

১১৬. তথ্য সন্ত্রাস, পৃঃ ১২১-১২৩।

সুধী পাঠক! আমরা যদি সারা বিশ্বের ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মোটামুটি একটা রিপোর্ট সংগ্রহ করি তাহলে দেখা যাবে যে, টিভি ও রেডিও জগৎ ৮০% ইহূদীদের একচ্ছত্র কব্জায় এবং বাকী ২০% খ্রীষ্টান নিয়ন্ত্রণে। বাকী থাকল প্রিন্টেড মিডিয়ার হিসাব। আমেরিকা থেকে ১৫০০ সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে ৭৫% সংবাদপত্রের মালিক ইহূদী। একজন ইহূদী ৫০টি সংবাদপত্র ও সাময়িক ম্যাগাজিন প্রকাশ করে থাকে। NEWS HOUSE ইহূদী মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান। এটি ২৬টি দৈনিক পত্রিকা ও ২৪টি ম্যাগাজিন প্রকাশ করে থাকে। তাছাড়া দি নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল এবং ওয়াশিংটন পোস্ট পৃথিবীর শীর্ষ ৩টি পত্রিকার নাম। নিউইয়র্ক টাইমস দৈনিক ৯০ লাখ কপি ছাপা হয়। এই ৩টি পত্রিকাও যথারীতি ইহূদী মালিকানাধীন।

ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও সংবাদপত্রের পর নিউজ এজেন্সী ও ইন্টারনেটের দুনিয়া। পৃথিবীর তিন শীর্ষ সংবাদ সংস্থার নাম যথাক্রমে এ.এফ.পি, রয়টার্স এবং এপি। এই ৩টি নিউজ এজেন্সির উপরও ইহূদীদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব। ইন্টারনেটের তো আবিষ্কারকই ইহূদীরা। বিশ্বের সমস্ত ছার্চ ইঞ্জিন তাদের হাতে। ইন্টারনেটে এরা কৃত্রিম ইসলামের ১৩০টি ওয়েবসাইট তৈরি করে রেখেছে, যার মাধ্যমে এরা নওমুসলিম ও দুর্বল মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছে প্রতিনিয়ত। সি.এন.এন, এইচবিও, মুভি চ্যানেল এবং স্টার প্লাসের নেপথ্যে কারা কলকাঠি নাড়ে? এদের ফ্লিম যোগান দেয় কারা? ইন্টারনেট ও নিউজ এজেন্সির মাধ্যমে সারা দুনিয়ার তথ্য প্রবাহ পরিচালনা করছে কারা? এসব প্রশ্নের একটাই উত্তর ইহূদী।

জনৈক মার্কিন মনীষীর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি বারবার মনে পড়ে যায়। তিনি বলেন, 'ইহূদীরা মুসলিম এবং খ্রীষ্টান এবং উভয় জাতিকে শত্রু জানে। উভয় জাতিকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। কিন্তু তাদের হাতে এত শক্তি না থাকায় শত্রুদের শায়েস্তা করতে এক অদ্ভুত কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। তারা মুসলিম এবং খ্রীষ্টানদের পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিল। এবার এ যুদ্ধে উভয়পক্ষ মরবে। মাঝখানে ফায়দা লুটাবে ইহূদীগোষ্ঠী।

'পেনশন' নামে সম্প্রতি একটি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। ছবিটি ঈসা (আঃ)-এর জীবনের শেষ ১২ ঘণ্টাকে উপজীব্য করে তৈরি করা হয়েছে। এখানে ইহূদীরা ঈসা (আঃ)-কে কিরূপ নির্যাতন করেছে তা চিত্রায়িত করা হয়েছে; ফলে ইহূদীরা মিডিয়া সমূহে এ ছবির বিরুদ্ধে তুফান বইয়ে দিয়েছিল।

ইহূদীরা আমেরিকার সমস্ত মিডিয়া কিনে নিয়ে মার্কিনদের মস্তিষ্ক ধোলাই শুরু করে দেয়। তারা মার্কিন নাগরিকদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিতে সক্ষম হয়েছে যে, মুসলিমরা তাদের শত্রু। অন্যদিকে মুসলিমদের মনেও এ ধারণা পাকাপোক্ত করে দেয় যে, পৃথিবীতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যত কিছুই হচ্ছে সব খ্রীষ্টানরা করে যাচ্ছে।[১১৭]

মূলকথা হল 'তথ্য সন্ত্রাস ও মিডিয়া সন্ত্রাস'-এর জনক হল পশ্চিমা-খ্রীষ্টান-ইহূদী জগৎ। আর এটি আমাদের দেশে আমদানী করেছে কতিপয় হলুদ সাংবাদিক, যারা বিদেশী প্রভুদের কাছে

১১৭. গণমাধ্যম সাম্রাজ্যে ইহূদী রাজত্বের শ্বাস-রুদ্ধকর কাহিনী, খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ, দৈনিক ইনকিলাব, শিল্প-সংস্কৃতি, ১৭ আগস্ট ২০০৪, পৃঃ ১৬।

Contents

মন-মগজ বন্ধক দিয়ে তাদের এজেণ্ডা বাস্তবায়নেই সদা লিপ্ত থাকে।[১১৮]

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি :

খবর পরীক্ষা না করে প্রচার করা হারাম। আর সত্য-মিথ্যার মিশ্রণও অবৈধ। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ‘তোমরা মিথ্যার সঙ্গে সত্যের মিশ্রণ কর না এবং জেনেশুনে তোমরা সত্য গোপন করা না’ *(বাক্বারাহ ২/৪২)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ‘ যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তার অনুসরণ কর না। (মনে রেখ) শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ সব কিছুর জন্য জবাবদিহি করতে হবে’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ‘যে কথাই সে বলুক তা সংরক্ষণের জন্য একজন সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক তার নিকট নিযুক্ত আছে’ *(ক্বাফ ৫০/১৮)*।

আল্লাহ আরো বলেন, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ‘যারা নেক নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না। তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান’ *(নূর ২৪/৪)*।

মিথ্যাচার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ‘যারা মুমিন তারা মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করে না’ *(ফুরক্বান ২৫/৭২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ‘তোমরা মিথ্যা কথা বলা থেকে বেঁচে থাক’ *(হজ্জ ২২/৩০)*। আল্লাহ বলেন, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ‘অতএব তোমাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার কর’ *(হিজর ১৫/৯৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ‘তোমার কর্তব্য তো কেবল প্রচার করা, আর হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ’ *(রা‘দ ১৩/৪০)*।

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ‘হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর তবে তা তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না’ *(মায়েদা ৫/৬৭)*।

আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ‘হে মুমিনগণ, যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞাতবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও’ *(হুজুরাত ৪৯/৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً ‘আমার একটি কথা হলেও অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দাও’ *(বুখারী হা/৩৪৬১)*।

অতএব ইসলামে হলুদ সাংবাদিকতা এক জঘন্যতম পাপাচার বরং সর্বাপেক্ষা নিষিদ্ধ অপকর্ম। এতে ব্যক্তি বিশেষের মর্যাদা যেমন হ্রাস পায়, তেমনি অনুরূপভাবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। সুতরাং সত্য সংবাদ প্রকাশে সর্বদা তৎপর থাকতে হবে। আর জাতির সামনে সত্য কথা তুলে ধরার দায়িত্ব আজ সাংবাদিক সমাজের। মহান আল্লাহ সকল সাংবাদিককে মিথ্যা তথা হলুদ সাংবাদিকতা পরিহার ও সত্য কথা তুলে ধরার তৌফিক দান করুন-আমীন!!

[লেখক : সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলা]

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

লেখা আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে **‘সোনামণি’** (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)-এর মুখপত্র **‘সোনামণি প্রতিভা’**। আগ্রহী সোনামণি, ছাত্র, লেখক ও দায়িত্বশীলদের নিকট থেকে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটুখানি হাঁসি, অজানা কথা, কবিতা, মতামত, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানো ঠিকানা

সম্পাদক

সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলাম আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী

মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩; ০১৭৪৯-৪৫৯৯৯৭

১১৮. দৈনিক ইনকিলাব, ২৭ জুলাই ২০১১, পৃঃ ৮।

দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আধুনিক যুগ : ২য় পর্যায় (খ)
دور الجديد : المرحلة الثانية (ب)
জিহাদ আন্দোলন (২য় পর্যায়)
حركة الجهاد للأخوين الصادقفورى

মৌখিক তাবলীগের সাথে সাথে তিনি শাহ ইসমাঈল-এর কিতাবসমূহ ছাপিয়ে বিলি করারও ব্যবস্থা নেন। লাক্ষ্ণৌতে ছাপাতে ব্যর্থ হয়ে তিনি বাঙ্গালী শিষ্য ও খলীফা মৌলবী বদীউয্যামান বর্ধমানীকে এই কাজের দায়িত্ব দেন এবং তাঁকে কলিকাতা মিছরীগঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করেন। তিনি দশহাযার টাকা ব্যয়ে একটি প্রেস খরিদ করেন এবং অধিকাংশ দ্বীনী কিতাব সেখান থেকে ছেপে বিলি করেন। যার মধ্যে শাহ আবদুল কাদের (১১৬৭-১২৫৩/১৭৫৫-১৮৩৮)-এর তরজমা কুরআন শরীফও ছিল।[১১৯]

জিহাদে গমনের উদ্দেশ্যেই মাওলানা বেলায়েত আলী আমীর সৈয়দ আহমাদের সঙ্গে সীমান্তে হিজরত করেছিলেন। কিন্তু সৈয়দ ছাহেব তাঁকে দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে সোয়াত থেকে হিন্দুস্থান ফেরত পাঠান এবং বলেন যে, আমি আপনাকে বীজ হিসাবে হিন্দুস্থান ফেরত পাঠাচ্ছি। অর্থাৎ আপনার মাধ্যমে হাযারো গাছের জন্ম হবে।[১২০] হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) দীর্ঘ চার বছর যাবত তিনি দাওয়াতী কাজে ব্যাপৃত থাকেন। বালাকোটের শাহাদতের সময় তিনি হায়দরাবাদে ও মাওলানা মুহাম্মাদ আলী রামপুরী মাদ্রাজে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এই বিপর্যয়ের খবর কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি পুনরায় জিহাদ সংগঠনের উদ্দেশ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পুরোদমে শুরু করে দেন।

একই সময়ে পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি দাক্ষিণাত্য হ'তে আযীমাবাদ রওয়ানা হন। দুই বছর পরে (১২৪৮ হিঃ) সপরিবারে দেশে ফিরে নতুনভাবে সকলের নিকট হ'তে জিহাদের বায়'আত গ্রহণ করেন এবং এই সময় তিনি মেজ ভাই এনায়েত আলী-কে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। দু'বছর পরে (১২৫০/১৮৩৫ খৃঃ) তিনি নিজে বাংলাদেশে গমন করেন ও সেখান থেকে সপরিবারে হজ্জে রওয়ানা হন। কয়েক বছর আরব দেশে কাটিয়ে কলিকাতা ফিরে এসে পুনরায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন। অতঃপর মাওলানা এনায়েত আলী-কে সাথে নিয়ে আযীমাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। সুশৃংখলভাবে দাওয়াতী কাজ চালু করার জন্য তিনি কয়েকজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খলীফাকে বিশেষ বিশেষ এলাকার জন্য নিযুক্ত করেন যাঁদের প্রধান কাজ ছিল শিরক-বিদ'আত দূরীকরণ, আক্বীদা সংশোধন এবং জিহাদ-এর ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার সাথে সাথে জিহাদ সংগঠন-এর জন্য লোক ও রসদ সংগ্রহ করা। মাওলানা বেলায়েত আলীর খলীফাগণ নিম্নোক্ত এলাকাসমূহে উক্ত দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন।[১২১]

১। শাহ মুহাম্মাদ হুসাইন; ছাপরা, মুযাফ্ফরপুর, তিরহাট ও পাটনার পার্শ্ববর্তী এলাকা।

২। মাওলানা এনায়েত আলী; বাংলাদেশ এলাকা।

৩। মওলবী যয়নুল আবেদীন হায়দরাবাদী; এলাহাবাদ এলাকা।

৪। মওলবী মুহাম্মাদ আব্বাস হায়দরাবাদী; উড়িষ্যা এলাকা। এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকেও গ্রামে-গঞ্জে তাবলীগে প্রেরণ করেন।[১২২]

লেখনী :

সর্বদা দাওয়াত ও তাবলীগ এবং জিহাদ সংগঠনে ব্যস্ততার মধ্যেও মাওলানা বেলায়েত আলী উর্দূ, ফারসী ও আরবী ভাষায় সাতটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। যেমন- ১. রাদ্দু শিরক বা শিরকের প্রতিবাদ (ফারসী) ২. আমল বিল-হাদীছ বা হাদীছ অনুযায়ী আমল (ফারসী) ৩. 'আরবাঈন ফিল-মাহ্দিহঈন' মাহ্দী (আঃ) সম্পর্কে ৪০টি হাদীছ (আরবী) ৪. রিসালা-ই-দাওয়াত, তাবলীগী পুস্তিকা (উর্দূ) ৫. তায়সীরুছ ছালাত, সহজ ছালাত শিক্ষা (উর্দূ) ৬. 'শাজারাহ' স্বীয় বংশ তালিকা (উর্দূ) ৭. তিব্ইয়ানুশ শিরক, শিরকের বর্ণনা (উর্দূ)। জীবনীকার ভাতিজা মাওলানা আবদুর রহীম 'রাসায়েলে তিস্'আ'র মধ্যে যুক্তভাবে এগুলি প্রকাশ করেন।[১২৩]

আহলেহাদীছ আন্দোলনে বেলায়েত আলীর অবদান :

মাওলানা বেলায়েত আলী জামা'আতে মুজাহেদীনের শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। সৈয়দ আহমাদের জীবদ্দশায় তিনি যেমন শাহ ইসমাঈলের জামা'আতে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হতেন। সাইয়িদ আহমাদ ও শাহ ইসমাঈলের পরে বেলায়েত আলীই ছিলেন জামা'আতে মুজাহেদীনের সর্বসম্মত নেতা।[১২৪] তিনি ও তাঁর পরিবারের প্রধান লক্ষ্য ছিল জিহাদ, যার মাধ্যমে তাঁরা নাছারা অধিকৃত হিন্দুস্থানকে 'দারুল ইসলামে' পরিণত করতে প্রস্তুত এরূপ লোক বাছাই করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ করতে গিয়েই তাঁরা ইসলামের নামে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতসমূহের বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা এদেশের প্রচলিত মাযহাবী অনুসরণ থেকে বিরত থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

বাংলা ও বিহারের যেসব তাঁদের প্রভাবাধীন ছিল, সেই সব এলাকার অধিকাংশ মুসলিম অধিবাসী আজও 'আহলেহাদীছ' হিসাবে বসবাস করছেন। ছাদিকপুরী পরিবারের জীবনী 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ'-তে তাঁদেরকে (حنفى مع القول بالترجيح) অর্থাৎ 'ইমামের কথার উপরে হাদীছের নির্দেশকে অগ্রাধিকার দানকারী হানাফী' বলে যে আখ্যা প্রদান করা হয়েছে[১২৫] তা

---

১১৯. 'সারগুযাস্ত', পৃঃ ২১৭।
১২০. আলী নদবী, 'ছীরাতে সাইয়িদ আহমাদ', পৃঃ ৪১৬।
১২১. 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ', পৃঃ ৯৮।
১২২. নদবী, 'ছীরাতে সাইয়িদ আহমাদ', পৃঃ ৪১৭; 'সারগুযাস্ত', পৃঃ ২১৬।
১২৩. মৌলবী আবদুর রহীম হাশেমী যুবায়রী, 'মাজমূ'আ রাসায়েলে তিস্'আ' (দিল্লী মাতবা'আ ফারূকী, সালবিহীন)। বাকী দু'টি বইয়ের একটি হ'ল- মাওলানা এনায়েত আলী রচিত 'বুত্ শিকন' -উর্দূ এবং অন্যটি হ'ল মাওলানা ফাইয়ায আলী বিন এলাহী বখ্শ রচিত 'ফায়যুল ফুয়ূয' -ফারসী।
১২৪. 'সারগুযাস্ত', পৃঃ ২১৩; আলী নদবী, 'ছীরাতে সাইয়িদ আহমাদ শহীদ', পৃঃ ৪১৫।
১২৫. মাসঊদ আলম নদভী, 'ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী আওর উন্কে আফকার পর এক নযর' (লাহোর : দার সালাফিইয়াহ'), পৃঃ ৯৪।

মূলতঃ আহলেহাদীছ তরীকারই বক্তব্য। এক্ষণে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরীক্ষা করে দেখব।-

মাওলানা বেলায়েত আলীর মাসলাক :

মাওলানা ও ছাদিকপুরী জীবনীকার আবদুর রহীম যুবায়রী (১২৫২-১৩৪১/১৮৩৬-১৯২৩) বিন ফারহাত হুসাইন (মৃঃ ১২৭৪ হিঃ) স্বীয় চাচা মাওলনা বেলায়েত আলীর 'মাসলাক' সম্পর্কে বলেন, 'রায়বেরেলীতে অবস্থানকালে তিনি আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমাঈলের জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বেলায়েত আলীকে হাদীছ পড়াতেন। শুধু তাই নয় আল্লামা ইসমাঈল তাঁকে তাঁর জামা'আতের নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন'।[১২৬]

আল্লামা ইসমাঈল-এর শিক্ষা, সংসর্গ ও প্রশিক্ষণের ফলে তাঁর মধ্য থেকে তাক্বলীদী গোঁড়ামী দূর হয়ে যায় এবং সরাসরি সুন্নাতের উপরে আমলের জাযবা সৃষ্টি হয়। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং ওয়ায ও নছীহতের ফলে হিন্দুস্থানে 'আমল বিল-হাদীছ'-এর চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং তাক্বলীদ ও গোঁড়ামীর ভিত্ কমজোর ও দুর্বল হয়ে যায়'।[১২৭]

মাওলানা মাসঊদ আলম নাদবী বলেন, 'বিদ'আতের বিরুদ্ধে কয়েকটি কিতাব তিনি প্রকাশ করেন এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি স্বীয় পরিবারে 'আমল বিস্-সুন্নাহ'-এর প্রচলন ঘটান। বিহার ও বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন তিনি নিজ পরিবার থেকেই শুরু করেন'।[১২৮]

'আমল বিল-হাদীছ' বা 'আমল বিস্-সুন্নাহ' ইত্যাদি শব্দ সাধারণতঃ আহলেহাদীছদের শানেই ব্যবহৃত হয়। অতঃপর মাসঊদ আলম নাদবী মাওলানা বেলায়েত আলীর মাধ্যমে যেসব সুন্নাতের পুনর্জীবন ঘটেছে তার তালিকা দিয়েছেন, যার মধ্যে একটি সুন্নাত হ'ল- 'জনৈক মিসকীন আবদুল গণী নগরনাহ সাভীকে তিনি একজন বিধবার সঙ্গে মোহর হিসাবে কেলবলমাত্র কুরআন পড়ানোর (تعليم قران) বিনিময়ে বিবাহ দেন'।[১২৯]

মাওলানা বেলায়েত আলী নিজ বাড়ীতে থাকাকালীন সময়ে প্রতিদিন যোহর হ'তে আছর পর্যন্ত সকলকে কুরআন মজীদ ও বুলূগুল মারাম-এর তরজমা ও তাফসীর শুনাতেন। তাছাড়া নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (১২৪৮-১৩০৭/১৮৩২-৯০) নিজে জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন যে, মাওলানা বেলায়েত আলী আমার কৈশোরকালে যখন কণৌজ আসেন ও আমাদের বাড়ীতে অবস্থান করেন তখন আমাকে তিনি 'বুলূগুল মারাম' পড়ার উপদেশ দিয়ে যান।[১৩০] অধিকন্তু তিনি শাহ ইসমাঈলের পুস্তিকাসমূহ দিল্লী থেকে আনিয়ে তা ছাপিয়ে বিলি করার ব্যবস্থা নেন।[১৩১] হজ্জের সফরে তিনি ইয়ামনে চলে যান এবং খ্যাতনামা আহলেহাদীছ মনীষী ইয়ামনের বিচারপতি কাযী মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানীর (১১৭২-১২৫০/১৭৫৮-১৮৩৫) নিকট হ'তে হাদীছের সনদ লাভ করেন ও তাঁর কিছু কিতাব সঙ্গে আনেন।[১৩২]

এখানে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় : (ক) লোকদেরকে কুরআন শিখানোর পর পরই রেওয়াজ অনুযায়ী কোন ফিক্হের কিতাব না পড়িয়ে তিনি হাদীছের কিতাব 'বুলূগুল মারাম' পড়াতেন (খ) খাছ করে শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর কিবাতগুলি ছাপিয়ে বিলি করায় অনুমিত হয় যে, বেলায়েত আলী তাঁর উস্তাদ শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর ন্যায় আহলেহাদীছ ছিলেন (গ) তৃতীয় আরেকটি বিষয় হ'ল মাওলানা বেলায়েত আলী সুদূর ইয়ামনে গিয়ে ক্বাযী মুহাম্মাদ বিন আলী শাওকানীর নিকটে হাদীছের সনদ নিলেন। যিনি নিজেই একজন স্বনামধন্য আহলেহাদীছ বিদ্বান হিসাবে সারা বিশ্বে পরিচিত। এতে ধারণা করা যায় যে, মাওলানা বেলায়েত আলী 'সালাফী' তরীকার অনুসারী ছিলেন।

দারুল উলূম দেউবন্দ-এর খ্যাতনামা শিক্ষক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধু হানাফী বলেন, 'পাটনার মাওলানা বেলায়েত আলী বালাকোট যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর সেই জামা'আতের একজন বিশেষ স্তম্ভবিশেষ (خاص ركن) ছিলন, যা মাওলানা ইসমাঈল 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' পড়ার পর সেই অনুযায়ী গড়ে তুলেছিলেন। এঁরা (ছালাতে) 'রাফ্উল ইয়াদায়েন' করতেন ও সশব্দে 'আমীন' বলতেন'।[১৩৩]

উপরোক্ত আলোচনার পর এবারে আমরা মাওলানা বেলায়েত আলীর নিজস্ব রচনাবলী থেকে তাঁকে যাচাই করব। তিনি মোট সাতটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। প্রথম পুস্তিকা 'রাদ্দু শিরক'-এর শেষে লিখিত ক্বাছীদায় তিনি বলেন,[১৩৪] 'শত আফসোস যে, এযুগের আলেমরা ধোকা দেওয়াকেই নিজেদের নিদর্শনে (شعار خود) পরিণত করেছেন। তারা কুরআন ও হাদীছকে গোপন রেখে তার আসল বক্তব্য পরিবর্তন করে ফেলেন। হে পাকদিল মুমিন মুসলমান! যদি তুমি তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহ্র) রেযামন্দী চাও, তাহ'লে কুরআন ও হাদীছ অনুযাযী জীবন গড়ো। অন্য কারু কথায় চলো না'। এই ধরণের বক্তব্য একজন সালাফী প্রতিভার কলম হ'তেই সাধারণতঃ বের হয়ে থাকে।

তাঁর একটি অনন্য পুস্তিকা হ'ল 'আমল বিল-হাদীছ', যা হাদীছের অনুরসণ ও ইমামদের তাক্বলীদ বিষয়ক প্রশ্নসমূহের জওয়াবে ফারসী ভাষায় লিখিত। শুরুতে তিনি বলেন, 'হাদীছের ও ফিক্হের অনুসরণ সম্পর্কে এই ফকীরের নিকট বহু প্রশ্ন আসছে। এজন্য আমি ভাবলাম যে, এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা সংকলন করি, যা সকল জিজ্ঞাসু মনের খোরাক হবে। মানুষকে বারবার কষ্ট হ'তে রেহাই দেবে এবং বন্ধুদের কাছেও একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে'।[১৩৫]

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ' (পিএইচ.ডি থিসিস) শীর্ষক গ্রন্থ। পৃঃ ২৯২-২৯৭]

---

১২৬. 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ', পৃঃ ৯৪।
১২৭. হাফেয ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, 'তাহরীকে জিহাদ' (গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান : নাদ্ওয়াতুল মুহাদ্দেছীন, ১ম সংস্করণ ১৪০৬/১৯৮৬), পৃঃ ২২; 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ', পৃঃ ১০৬।
১২৮. 'পহেলা ইসলামী তাহরীক', পৃঃ ৪২।
১২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩।
১৩০. ছিদ্দীক হাসান খান-আত্মজীবনী 'ইবক্বাউল মিনান' (লাহোর : দারুদ দাওয়াতিস সালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৯৮৬), পৃঃ ৪৪-৪৫; 'তাযকেরায়ে ছাদেকাহ', পৃঃ ১০৬।
১৩১. 'পহেলা ইসলামী তাহরীক' পৃঃ ৪৪।
১৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৫।
১৩৩. 'তাহরীকে জিহাদ', পৃঃ ২৫ ; গৃহীত : 'শাহ অলিউল্লাহ আওর উন্কি সিয়ারী তাহরীক', পৃঃ ১৩০।
১৩৪. রাদ্দু শিরক, গৃহীত: 'রাসায়েলে তিস'আ', পৃঃ ২৮।
১৩৫. বেলায়েত আলী, আমল বিল-হাদীছ; গৃহীত : 'রাসায়েলে তিস'আ', পৃঃ ৩০।

আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত ভাষণ

পাবনার অভিভাষণ

[১৯৪৭ সালের ৯ই ও ১০ই মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত পাবনা যেলা আহলেহাদীছ কন্‌ফারেন্সে তৎকালীন 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ) প্রদত্ত অভিভাষণ]

(শেষ কিস্তি)

মহোদয়গণ, আজ পৃথিবীর সম্মুখে নিত্য নতুন যে সকল প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতেছে, তাহার মীমাংসার ভার আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, কুরআন ও সুন্নাতের নূর হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা স্বয়ং এইরূপ গোলক ধাঁধায় আটক পড়িয়াছে যে, মানবত্বের পূর্ণতা ও জ্ঞানের সজীবতার পথ তাহারা নিজেরাই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'** এই রুদ্ধ পথকে পুনরায় মুক্ত করিতে চায়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সহিত রাজনীতি এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, ইহাকে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর অপরিহার্য অংশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আহলেহাদীছগণের রাজনৈতিক কর্মসূচী সুস্পষ্ট এবং সর্বপ্রকার গোঁজামিলশূন্য। আমাদের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দ কুরআনী বা নববী সিয়াসাতের পরাজয় শিকার করেন নাই। তাঁহারা ইহার জন্য সম্মুখ যুদ্ধে সহাস্যবদনে প্রাণ দান করিয়াছেন। কিন্তু মুহাম্মাদী রাজনীতির সফলতা সম্বন্ধে মুহূর্তের জন্যও তাঁহাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই।

بناكردند خوش رسمي بخاك وخون غلط يدن

خدا رحمت كند اين عاشقل پاك طينت را

আহলেহাদীছগণ ধর্মীয় প্রেরণায় স্বাধীনতার মন্ত্রসাধক কিন্তু তাঁহাদের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য ভাত-কাপড়ের সংস্থান বা চাকুরীর সুবিধা অর্জন নয়, স্বদেশপ্রীতি ও জন্মভূমির উদ্ধার সাধনের উদ্দেশ্যে নয়, পৃথিবীতে বলবান ও শক্তিমান হইয়া অপরাপর দল, সমাজ ও জাতির উপর শাসনদণ্ড পরিচালানা করার মৎলবে নয় :

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

'যাহারা পৃথিবীতে বাড়াবাড়ি ও অশান্তিকামী নহে, আমি পারলৌকিক রাজ্যের অধিকারী তাহাদিগকেই করিব এবং যাহারা সতর্ক, পরিণাম তাহাদের জন্যই নির্দিষ্ট' *(ক্বাছাছ ২৮/৮৩)*।

আমাদের রাজনীতির চর্চার চরম ও পরম উদ্দেশ্য হল,

وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

'কুফরের আদেশকে পরাস্ত করিয়া একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশকে বলবৎ করা' *(তওবা ৯/৪০)*।

اَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

'মুসলিমগণের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট প্রার্থনা পদ্ধতিকে বলবৎ করিবে, ধন বণ্টনের যে এলাহী ব্যবস্থা আছে, তদনুসারে যাকাত আদায় করিবে, যাহা সর্বজনবিদিত সত্য তাহার আদেশকারী হইবে এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবে' *(হজ্জ ২২/৪১)*।

আমাদের সংগ্রাম সর্ববিধ ফেৎনার বিরুদ্ধে,

حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

'যাহাতে সকল প্রকার ফেৎনা নিরসন ঘটে এবং মানুষের প্রতিপালনীয় ও অনুসরণীয় যাহা তাহা যেন একমাত্র আল্লাহ্‌র আদেশে নিয়ন্ত্রিত হয়' *(বাক্বারাহ ২/১৯৩)*।

কিতাব ও সুন্নাতের বিরুদ্ধে যত প্রকার বিধান, মতবাদ, আইন, থিওরি, ফর্মুলা, প্রোগ্রাম ও Ism আছে সমস্তই অনাচার ও ফেৎনা। উক্ত ফেৎনাসমূহের মূলোৎপাটনকল্পে আত্মদান করাই **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর বহু বিশ্রুত সংগ্রামের উদ্দেশ্য। আল্লাহ তদীয় রাসূল, তদীয় কিতাব ও তদীয় রাসূলের সুন্নাতকে সমুন্নত, বলবৎ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার কার্যকেই আমরা মুসলিমগণের জাতীয় জীবনের উন্নতি, বিজয় ও প্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করি। আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) বাদ দিয়া জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা الحمية الجاهلية 'অমুসলিমের উত্তেজনা মাত্র'।

কুরআন ও হাদীছের কার্যতঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা স্বাভাবিক ও অনিবার্যরূপে মুসলিমগণের জাতীয় জীবন গৌরবমণ্ডিত হইবেই। ইসলামকে সর্বপ্রকার বাধা ও পরাধীনতার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া তাহার শাশ্বত, সনাতন ও চিরন্তন বিধানকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করাই আহলেহাদীছগণের রাজনীতি। এই আদর্শের জন্য আহলেহাদীছকে বাঁচিতে ও মরিতে হইবে। এই আদর্শের সংরক্ষণকল্পে সর্বপ্রকার ফিরিঙ্গী, হিন্দুয়ানী, কম্যুনিষ্টি ও নাস্তিকতামূলক এক কথায় যাবতীয় গায়ের ইসলামী প্রভাব হইতে হিন্দু ভূমি (পাক ভারত)-কে পবিত্র করিবার জন্য আহলেহাদীছগণকে জীবন পণ করিতে হইবে।

নানারূপ ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের জন্য এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়ে আহলেহাদীছকে ঘৃণিত প্রতিপন্ন করার ও তাহাদের আন্দোলনকে বিকৃত করিয়া প্রদর্শন করার চেষ্টা দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই সংশ্রবে খুব উঁচুদরের আলেম ও লেখকগণ যেভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। হানাফী দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ থানবী, যিনি আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক ছাহেব দেহলভীর ছাত্র ও শায়খুল ইসলাম সৈয়দ নাযীর হোসাইন দেহলভীর সহাধ্যায়ী ছিলেন। সুনানে নাসাঈর টীকায় লিখিতেছেন :

ثم ليعمل ان الذين يدينون دين عبد الوهاب النجاي ويسلكون مسالكه في الاصول والفروع ويدعون في بلادنا باسم الوهابون وغير المقلدين ويزعون ان تقليد الائمة الاربعة رضوان الله عليهم شرك وان

حق خالفهم هم المشركون ويتبيون قتلنا وسمي نسائنا و غير ذلك من العقائد الشنيعة التي وصلت الينا ايضا هم من فرقة الخوارج انتهي.

'আমাদের দেশে যাহারা ওয়াহ্হাবী গায়ের মুক্বাল্লিদ নামে কথিত, তাহারা আব্দুল ওয়াহ্হাব নযদীর দ্বীনের অনুসরণকারী। মতবাদ ও ব্যবহারিক শাস্ত্রে তাহারা তাহারই পন্থা পরিগ্রহণ করিয়া চলে। ইহারা ইমাম চতুষ্টয়ের তাক্বলীদ করাকে শিরক বলিয়া থাকে এবং আমাদের পুরুষদিগকে হত্যা করা এবং আমাদের নারীদিগকে দাসীতে পরিণত করা জায়েয মনে করে। তাহাদের এই সকল নিন্দনীয় মতবাদের কথা আমি শ্রবণ করিয়াছি এই ওয়াহহবীরা খাজেরীগণের অন্যতম *ফের্কা (সুনানে নাসাঈ (টীকা নং ১, পৃঃ ৩৬, মুজতাবায়ী প্রেস)*।

আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের উক্তিকে এরূপভাবে মান্য করা যে, তাহার বিপরীত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া বলিতে হইবে, এইরূপ তাক্বলীদকে শুধু আহলেহাদীছরাই হারাম ও শিরক বলেন নাই, বরং প্রচলিত মাযহাব চতুষ্টয়ের সহিত সম্পর্কিত সকল বিশ্বস্ত ও মুহাক্কিক আলেমও এই কার্যকে হারাম ও শিরক বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছেন। এমনকি স্বয়ং মহামতি ইমাম চতুষ্টয় পর্যন্ত এরূপ তাক্বলীদকে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং এই মতবাদের জন্য কেবলমাত্র আহলেহাদীছদিগকে অপরাধী করা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

> প্রকৃত কথা এই যে, আহলেহাদীছগণ আবু হানীফা অথবা আব্দুল ওয়াহহাব কাহারো দ্বীনের অনুসরণ করেন না। যে মনোনীত দ্বীনের বার্তা লইয়া জগৎগুরু, মানবমুকুট, খাতেমুল মুর্সালীন, আন্ননবীউল উম্মিউল আরাবী মুহাম্মাদ মুছত্বফা বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন আহলেহাদীছগণ কেবলমাত্র সেই দ্বীনকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং এই রাসূল (ছাঃ)-কে তাহাদের একচ্ছত্র নেতা ও ইমাম মান্য করিয়া তাঁহার তরীকার অনুসরণ করিয়া থাকেন।

মাওলানা থানবীর বাঁশীতে সুর ঝঙ্কৃত হইয়াছে তাহা সুদূরপ্রসারী হইলেও প্রকৃত বংশীবাদক তিনি নহেন, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর প্রভাব পৃথিবীতে সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তার বিরুদ্ধে Propaganda বা মিথ্যা প্রচারণার যে মায়াজাল বিস্তৃত করিতে ব্যাপৃত হন, তাহার কল্যাণে হিন্দের (পাক-ভারতের) মুহাম্মাদী বা **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'** ওয়াহ্হাবী আন্দোলন রূপে আখ্যাত হয়। শাসক প্রভুগণের এই সুর মাওলানা মুহাম্মাদ, মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী প্রমুখ ওলামার বাঁশীর ভিতর দিয়া হিন্দ ও বঙ্গের দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

نغبه از نائيست نئي از نئي بدان

مستي از سابق ست نئي از مئي بدان

আমার উক্তির বাস্তবতা William Hunter এর মুখ হইতে শ্রবণ করুন,

The Wahabis have not been allowed to spread their network of treason over Bengal without some opposition form their country men, Besides the odium thealogicum which rages between the Mohammedan sects almost as fiercely as if the were Christians. The presence of the Wahabis in a district is a standing meanace to all classes, whether Musalman or Hindu, possessed of prorerty or vested rights Revolutionists alike in politics ans religion, they go about their work not as reformers of the Luther or Cromwell type. but as destroyers in the spirit of Robespierre or Tanchelin of Antwerp. As the Utrecht clergy raised a cry of ferror when the last named scourge appared, so every Musalman priest with a dozen acres attached to his mosque or wayside shrine, generally a tamb has been shrieking against the Wahabis during the past half century.

In India, as elsewhere the landed and the Clerical interests are bound ub by a common dread of change. Any form of dissent. whether religious or political, is perilous to vested rights Now the Indian Wahabis are extreme Dissenters in both respects, Anabaptists, fiftn monarchy men , so to speak, touching matters of faith, Communists and Red Republicaans in politics.

বাঙ্গালায় ওয়াহহাবীরা তাহাদের বিদ্রোহ আন্দোলন তাহাদের আপন দেশবাসীগণের আংশিক বিরোধ ছাড়া পরিচালিত করিতে সক্ষম হয় নাই। ধর্মীয় মতবাদের দিক দিয়া মুসলিমগণের বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের বিরুদ্ধে এরূপ কঠোরভাবে খড়্গহস্ত, যেন তাহারা খ্রীষ্টান কোন যেলায় ওয়াহহাবীদের বিদ্যমানতা সেই যেলার সকল শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিম সম্পত্তিশালী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য সমানভাবে বিপজ্জনক। ওয়াহহাবীরা রাজনীতি ও ধর্ম উভয় ব্যাপারেই বিপদ সৃষ্টি করিতে চায়, তাহাদের কার্যপদ্ধতি লুথার অথবা ক্রমওয়েলের মত গঠনমূলক নয়, বরং রবসপেয়ী ও এন্টুয়ার্পের টেনচলিনের পরিগৃহীত পদ্ধতির ন্যায় ধ্বংসমূলক। এটারিষ্টের পাদ্রিরা টেনচলিনের আতঙ্কে যেরূপ চিৎকার করিয়া উঠিত, মুসলিম মোল্লারা যাহারা মসজিদ ও মাযারের দরগাহ সম্পর্কে কিছু জোতজমি উপভোগ করিত তাহারা তদ্রূপ বিগত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া ওয়াহহাবীদের ভয়ে কম্পিত হইতেছে!

অন্যান্য দেশের ন্যায় হিন্দেও জমিদার ও ধর্মনেতার দল সর্ববিধ বিপ্লবকে ভয় করিয়া থাকে। চিরাচরিত অধিকারের বিরুদ্ধে, তাহারা রাজনৈতিক হউক আর ধর্মীয় অধিকার লইয়া হউক, সকল প্রকার বিবাদ কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য বিপজ্জনক। হিন্দের ওয়াহাবী দুই দিক দিয়াই খুব কঠোর বিপ্লবী। ধর্মের দিক দিয়া তাঁহারা ইনাবিট্স ও পঞ্চম সাম্রাজ্যবাদীদের (বাহিনী) অনুগমনকারীদের ন্যায় আর রাজনীতির সহিত তাহাদের

আন্দোলনের যতটা সম্পর্ক, সেদিক দিয়া তাহারা কমিউনিষ্ট ও রক্তবর্ণ গণতন্ত্রবাদীদের মত *(Our Indian Musalman, P. no : 107)*।

ইউরোপীয় প্রভুগণের প্রচারণার ফলেই হিন্দ ও বঙ্গের **আহলেহাদীছ আন্দোলন** ওয়াহ্হাবী আন্দোলন রূপে কথিত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রদত্ত বিশ্লেষণ অনুসারেই আহলেহাদীছগণ কখনো খারেজী, কখনো শী'আ প্রভৃতি মূল্যবান উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালার তাক্বলীদপরস্তদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্ব স্ব গ্রন্থে উক্ত অভিযোগ সমূহের চর্বিত চর্বণ করিয়া আহলেহাদীছগণের যোগসূত্র খারেজী আর রাফেযীদিগের সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন এবং কোন কোন তথাকথিত প্রগতিবাদী লেখক এই আবিষ্কারের সাহায্যে আপন বিদ্যাবত্তা ও গবেষণার অপূর্ব পরিচয় প্রদান করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন।

যাবতীয় মিথ্যা অভিযোগের উত্তরে আমি শুধু পারস্যের অমর কবি হাফিযের এই কবিতা পাঠ করিব :

بدم كفي وخر سفدم عفاك الله ذكر گفتي!

جواب تلخ مي زيبد لب لعل شكر خارا!!

আহলেহাদীছগণ সকল আহলে কেবলার সকল মানুষকেও মুসলিম মনে করেন এবং যতক্ষণ কেহ দ্বীনের অত্যাবশ্যক ও সুস্পষ্ট মতবাদগুলি হঠকারিতার সহিত খোলাখুলিভাবে অস্বীকার না করিবে, তাহার ধন, প্রাণ, সম্পদ ও মর্যাদাকে আহলেহাদীছগণ আপন প্রাণ, সম্পদ ও মর্যাদায় তুল্য মূল্যবান মনে করিয়া থাকেন।

প্রকৃত কথা এই যে, আহলেহাদীছগণ আবু হানীফা অথবা আব্দুল ওয়াহহাব কাহারো দ্বীনের অনুসরণ করেন না। যে মনোনীত দ্বীনের বার্তা লইয়া জগৎগুরু, মানবমুকুট, খাতেমুল মুর্সালীন, আন্নবীউল উম্মিউল আরাবী মুহাম্মাদ মুছত্বফা বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন আহলেহাদীছগণ কেবলমাত্র সেই দ্বীনকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং এই রাসূল (ছাঃ)-কে তাহাদের একচ্ছত্র নেতা ও ইমাম মান্য করিয়া তাঁহার তরীকার অনুসরণ করিয়া থাকেন।

ما قصة سكندر ودارا فخر افد ايم

ازما بجز حكايت مهر ووفا ميرس!

কিতাব ও সুন্নাতের একচ্ছত্র ও স্বাধীন রাজত্ব অস্বীকার করার ফলে ইসলামের প্রথম সহস্রকের পর মুসিলম জগতের সর্বত্র মতবাদ ও আচরণের দিক দিয়া যে ঘোর অবনতি আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল, আমেরিকান ঐতিহাসিক Lothrop Stoddard তাহার New world of Islam নামক গ্রন্থে তাহার আংশিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

As for religion it was as decaden as everything else, the austre monotheism of Muhammad had become overlaid with a rank growth of superstition and puerile mysticism. The mosques stood unfrequented and ruinous, deserted by the ignorant multitude which decked out in amulets. charms and rosaries listnd to squalid faqirs or ecstatic deruishes and went on pilgrimages to the tombs of `holy man' worshipped as saints and `intercessors' with that Allah who had become too remote a being for the direct devotion of these benighted souls. *(P. no : 10-21)*।

ইহার ভাবার্থ এই যে, 'অন্যান্য বিষয়ের মতই ধর্মও পতনের চরম সীমায় পৌঁছে গেল। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দৃঢ় কঠোর একত্ববাদ চপল অতীন্দ্রিয়বাদের জঞ্জাল এবং কুসংস্কারের বেশুমার আগাছায় ভর্তি হইয়া উঠিল। মসজিদসমূহ আনাবাদ হইয়া উঠিল এবং ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিল। অজ্ঞ জনসাধারণ মসজিদ পরিত্যাগ করিয়া কবচ ও জপমালায় দেহ সজ্জিত করিয়া ও জাদুমন্ত্রের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া নোংরা ফকীর ও উল্লসিত দরবেশের কথা শুনিতে লাগিল এবং পবিত্র হৃদয় ধর্মগুরুদের সমাধিস্থলে পূণ্য লাভেচ্ছায় তীর্থ যাত্রা শুরু করিল। তাহাদের হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের ন্যায় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের সপক্ষে বহুদূরে অবস্থানকরী আল্লাহ্র নিকট প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থনা, নিবেদন ও তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন অসম্ভব। বিধায় এই সব সাধুসজ্জনের সাহায্য গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তাই সুফারিশকারী মধ্যস্থ ব্যক্তিরূপে তাহারা সাধু ব্যক্তিদেরই পূজা শুরু করিয়া দিল'।

আজ মুসলিমগণ যে ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছেন তাহাদের নৈতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আকাশ যেরূপ তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সকল দুর্গতি ও সর্বনাশের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে কায়মনোবাক্যে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-কে পুনরুজ্জীতি করিতে হইবে। ইহাকে সম্প্রদায় বিশেষের দলগত আন্দোলন ভাবিলে চলিবে না। কিতাব ও সুন্নাতের পরিত্যক্ত জীবন কেন্দ্রের দিকে মুসলিমদিগকে দৃঢ়পদবিক্ষেপে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। শী'আ-সুন্নী নির্বিশেষে মুসলিম সংহতির যে আহ্বান আজ মুসলিমলীগ ঘোষণা করিয়াছে তাহা সনাতন **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এরই প্রতিধ্বনি মাত্র। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, বর্ণ ও মাযহাব নির্বিশেষে মুসলিমদিগকে শুধু বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থের পরিবর্তে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এ কুরআন ও হাদীছের কেন্দ্রে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করা ইয়াছে। **'আহেলহাদীছ আন্দোলন'**-এর পরিকল্পিত ইসলামী রাজত্ব বা ইলাহী হুকুমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ধারণা আংশিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মুসলিম হিন্দের মর্মবাণী আজ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর সুরে ঝঙ্কৃত হইবার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। সকল সন্দেহ ও অবসাদকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া **'আহলেহাদীছ আন্দোলন'**-এর দাবী নির্ভয়ে ও দৃপ্তকণ্ঠে জগদ্বাসীকে শুনাইতে হইবে। জগৎগুরু মানবমুকুট মুহাম্মাদ মুছত্বফা (ছাঃ)-এর ইমামৎ ও একচ্ছত্র আধিপত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে জীবন পণ করিতে হইবে। আমাদের নবজাগরণের যদি এই কার্য আমরা আংশিকরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হই, তবেই আমদের সকল শ্রম সার্থক ও আমাদের জীবন ধন্য ও বরেণ্য হইবে।

[দ্রষ্টব্য : আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী প্রণীত 'আহলেহাদীছ পরিচিতি' গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪-৪৪]

আযানের মধুর ধ্বনিতে ইসলামের ছায়াতলে এক ইহূদী নারী

*সা*ন্দ্রা নাউয়ি একজন ইহূদী নারী। জীবনের নানা বাধা-বিঘ্নতায় তিনি ছিলেন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। শান্তির সন্ধানে ছুটেছেন দেশ-দেশান্তরে। অবশেষে আযানের মধুর ধ্বনি তার মনে আনে পরিপূর্ণ শান্তি। খুঁজে পান ইসলামের পরশ। না, তাকে ইসলাম গ্রহণে কেউ বাধ্য করেনি। হিজাব পরতেও তাকে বাধ্য করা হয়নি। তিনি নিজেই এটি বেছে নিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণ করে তিনি বর্তমানে একজন মুসলিম হিসাবে জীবন-যাপন করছেন।

সুধী পাঠক! সান্দ্রার মুখেই শুনুন ইসলাম গ্রহণের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা :

তিনি বলেন, আমার জীবনে সবসময়ই কিছু একটার অভাব অনুভব করতাম। একপর্যায়ে আমি ধর্মের অর্থ খুঁজতে সচেষ্ট হই। কিন্তু সব ভুল জায়গায় এবং ভুল পদ্ধতিতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইউরোপ অনেকটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। যুদ্ধের সময় আমার পরিবার লুকিয়ে ছিল। আমার পিতামহকে বন্দী করার পর তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় আমার মা তার পিতাকে হারায়।

১৯৫৭ সালে আমার মা-বাবা জার্মানির ম্যানহেইম থেকে কানাডায় চলে যায়। আমার মা-বাবা ইহূদী এবং ইহূদী পরিবারেই আমার জন্ম। যুদ্ধের পর আমার বাবা-মা উভয় বেশ তিক্ত ছিল এবং অনেকটা বাধ্য হয়েই নতুন দেশে একটি নতুন জীবন শুরু করতে চেষ্টা করে। তারা কানাডায় কানাডিয়ানদের মত হওয়ার কঠোর চেষ্টা করে। তারা সেখানে তাদের নাম পরিবর্তন করে এবং তাদের ঐতিহ্যকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রাখে।

আমি আমার মা-বাবা থেকে ভিন্ন ছিলাম। আমি আমার ইহূদী বিশ্বাসকেই গ্রহণ করি কিন্তু আমি তখনও কিছু একটার সন্ধানে ছিলাম। আমি জানি না সেটা কি। যখন আমার অনুসন্ধান শেষ, তখন সান্দ্রা আর সান্দ্রা নেই। সান্দ্রার স্থান দখল করে হয় সালমা। ইহূদী ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করার সময় আমি সালমা নামটি বেছে নেই। কেননা সালমা (উম্মে সালমা) ছিলেন মহানবী (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের একজন। তিনি ছিলেন এমন একজন নারী, যিনি সবাইকে দেখাশোনা করতেন এবং এটি আমার নিজের নামের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ। কেননা আমি আমার সান্দ্রা নামের অর্থ অনুসন্ধান করে জেনেছি, সান্দ্রা মানে 'মানবজাতির সাহায্যকারী'।

ইসলামে প্রথম পরিচয় :

সম্ভবত আমার বয়স যখন ১৩ বছর, তখন ক্যাট স্টিভেন্স নামে এক লোকের কথা জানতে পারি যিনি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এবং যিনি এখন ইউসুফ ইসলাম নামে পরিচিত। আমাকে তার এই বিষয়টি মুগ্ধ করে এবং তখন থেকেই ইসলাম সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি।

আমার টিনেজার বয়সটি ছিল আমার জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং। আমি বিদ্রোহী টাইপের ছিলাম না। বরং কেবলই অসন্তুষ্ট ছিলাম। আমি বাড়িতে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। এই কারণে আমি ১৭ বছর বয়সেই বাড়ি ত্যাগ করি।

২০০১ সালে আমি এক মাতাল ড্রাইভারের আঘাতের শিকার হই। তার আঘাতের কারণে আমাকে পুনরায় হাঁটতে শিখতে হয়। নেশা করে এই মাতাল ড্রাইভার আমার গাড়িতে জোরে আঘাত করে। ফলে উক্ত আঘাতে আমার গাড়ি বাতাসের সাথে উড়তে থাকে। তখন আমি আমার জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। আমার কাছে কেবলই মনে হয়েছিল, আমি নিশ্চিত মারা যাচ্ছি। দুর্ঘটনাটি এমন একসময়ে ঘটে যখন আমি আমার জীবন নিয়ে অনেকটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। আমি সত্যিই জানতাম না আমি আসলে আমার বাকি জীবনে কি করতে চাচ্ছি।

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট হচ্ছে আমার মায়ের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া এবং ২০০৫ সালে তার মৃত্যু। আর এই সমস্ত ঘটনাই আমাকে ইসলামের প্রতি ধাবিত করে।

আযানের সুমধুর ধ্বনি :

২০০৫ সালে আমি ভারতে যাই। এটি ছিল আমার মায়ের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর। আমি যখন সেখানে যাই তখন ছিল রামাযান মাস। সেখানে প্রথম রাতে আমি ঘুমাতে যাই। ভোর ৫ টায় আযানের শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আযানের শব্দের সেই সম্মোহনী শক্তি আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে। তখন আমি কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। দূর থেকে ভেসে আসা এই আযান আমার মনে পরিপূর্ণ সুখ, শান্তি ও একাত্মতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। আমি আনন্দে কেঁদে ফেলি। আমার এই কান্না ছিল বিশ্বাসের কান্না। তৃপ্তির কান্না ও হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার কান্না।

২০০৫ সালে আমি ভারত যাই। এটি ছিল আমার মায়ের মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পর। আমি যখন সেখানে যাই তখন ছিল রামাযান মাস। সেখানে প্রথম রাতে আমি ঘুমাতে যাই। ভোর ৫ টায় আযানের শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আযানের শব্দের সেই সম্মোহনী শক্তি আমাকে মুগ্ধ করে। আমি আসলে কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আমি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। দূর থেকে ভেসে আসা এই আযান আমার মনে পরিপূর্ণ সুখ, শান্তি ও একাত্মতার অনুভূতি সৃষ্টি করে। আমি আনন্দে কেঁদে ফেলি। আমার এই কান্না ছিল বিশ্বাসের কান্না।

কালেমা পাঠ :

আমি কালেমা শাহাদত পাঠ করতে এক ইমামের দ্বারস্ত হই। তার নিকট গেলে তিনি আমাকে এই সম্পর্কে ধারণা দেন। তিনি আমাকে বলেন, 'কালেমা শাহাদত হচ্ছে ইসলামের একটি ঘোষণা। এটি কেবলমাত্র একটি স্বীকৃতি। এটি হল তাই, যা আপনি বিশ্বাস করেন। আপনি ইসলামের প্রতি আপনার বিশ্বাস ঘোষণা করেছেন এবং আপনাকে নিম্নলিখিত দু'টি বাক্য বলতে হবে, যা সাক্ষ্য হিসাবে বহন করবে। আর তা হল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'। তখন আমি বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে এটি করতে অগ্রসর হলাম এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট তার আশীর্বাদ ও প্রার্থনা করলাম এবং ঐ আনন্দের মুহূর্তে আমরা সবাই সাক্ষী হলাম। অতঃপর আমি ইমামের সাথে সাথে বললাম, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ। তিনি আমাকে এর অর্থ শুনালেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল'। আমার শাহাদত পাঠের পর তিনি আমাকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'জাযাকাল্লাহু খায়রান। আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ'।

আমার ইসলাম গ্রহণের এই কথা আমার পরিবার এবং বন্ধুদের মাঝে বলা একটু কষ্টকর ব্যাপারই ছিল। আমি বলতে চাচ্ছি, এটি বলার আমার কোনো উপায় ছিল না যে, আমি ইহূদীধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়ে গেছি।

হিজাব পরিধান :

আমি প্রথম যখন হিজাব পরতে শুরু করি, প্রথম চার সপ্তাহ ভয়ঙ্কর স্নায়ুবিক দুর্বলতায় ভুগতাম। আমার কথা এবং চিন্তা সম্পর্কে অন্যদের প্রতিক্রিয়া কি হবে এই ভাবনায় ছিল তার মূল কারণ। কিন্তু প্রথম এই চার সপ্তাহ পরেই স্বস্তিবোধ করি।

হিজাবের প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়ায় আমি ক্রমাগত বিস্মিত হয়েছি। সমস্যাটি হল উত্তর আমেরিকার মানুষরা হিজাব পরিহিত নারীকে নিপীড়িত এবং পরাধীন হিসাবে মনে করেন। হয়তো কিছু দেশে কিংবা কিছু শাসন ব্যবস্থায় এটি সত্য হতে পারে কিন্তু কানাডার জন্য নয়। এখানে আমাদের পসন্দের স্বাধীনতা রয়েছে এবং আমি এটিই বেছে নিয়েছি।

আমি মনে করি, তারা যাই মনে করুক না কেন নারীদের শরীর ঢেকে রাখতে হিজাব পরিধান করা অতি যরূরী। পবিত্র কুরআনেও তাই বলা হয়েছে। হিজাব পরে আমি সত্যিই স্বস্তি অনুভব করি। আমি আনন্দিত এটি পরে। এখনতো হিজাব ছাড়া বাইরের জনমুখে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারি না।

প্রথমবারের মত আমি যখন হিজাব পরিধান করে আমার কর্মস্থলে যাই, তখন আমি সামান্য নার্ভাস ছিলাম। আমি শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি 'লিগ্যাল ফার্মে' আইনি সহকারী হিসাবে কাজ করি। সুতরাং এখানে পোশাকের ব্যাপারে সামান্য রক্ষণশীলতার বিষয় রয়েছে। আমি আমার সহকর্মীদের কাছ থেকে যে অভ্যর্থনা পেয়েছি তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল মধুর। তবে কেউ কেউ মুখে ভেংচি কাটত, কেউ আবার কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত এবং আমার অনেক সহকর্মী আমার ডেস্কের পাশ দিয়ে যেতে সঙ্কোচবোধ করত।

দুঃখের বিষয় হল, আমার সবচেয়ে খারাপ এক অভিজ্ঞতা হয়েছে, যা আমি মুসলিম সম্প্রদায় থেকে পেয়েছি। এক শুক্রবার আমি জুম'আর ছালাতের জন্য বের হই। পথিমধ্যে আমার ফোন বেজে ওঠে এবং এটি ছিল একজন মুসলিম মহিলার ফোন। তিনি আমাকে বলেন, 'আপনি এখনও হিজাব পরেন?' আমি তাকে উত্তরে বললাম 'হ্যাঁ'। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, 'ও আচ্ছা, আমার সব বন্ধুরা তো হতবাক কেমন করে এক শ্বেতাঙ্গ মেয়ে মুসলিম হওয়ার ভান করছে'। তাদের এই ধরনের মন্তব্য আমার হৃদয়ে আঘাত করে। এই কারণে যে আমি কোনো ভান করছি না।

আমি উত্তর আমেরিকান হওয়ার কারণে লোকজন সবসময়

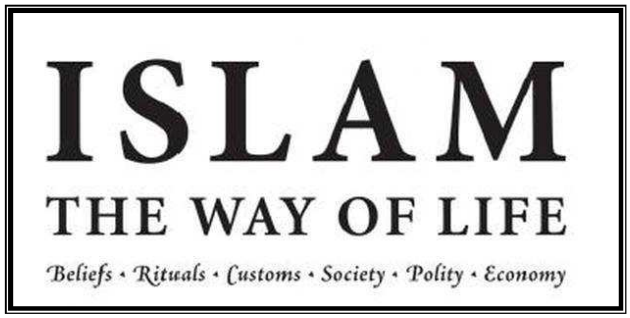

এমনটি মনে করে থাকে এবং তারা মনে করে, আমি ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়ে রাজনৈতিক বিবৃতি সৃষ্টি করছি। কিন্তু আমি মনে করি বিবৃতি সৃষ্টি করার চেয়েও বড় কথা হল, আমি কে। আমি একজন মুসলিম এবং আমি হিজাব পরিধানকেই বেছে নিয়েছি। এখানে একটি প্রথা প্রচলিত আছে আর তা হল লোকজন নিশ্চিত ধরে নেয় যে, উত্তর আমেরিকান মহিলাদের মধ্য যারা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে, তারা সবাই বিবাহিত। তিনি অবশ্যই এটি করেছেন তার স্বামীর জন্যই। যথেষ্ট বিস্ময়কর, কিন্তু আসলে তা নয়। আমি একজন মুসলিম নারী। আমি আমার সঙ্গীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার অনেক পূর্ব থেকেই হিজাব পরছি।

আমার স্বামী শেখ জামাল যাহাবী ১৯৮০ সালে লেবানন থেকে কানাডায় আসেন। তিনি একটি ইসলামী কেন্দ্রের একজন সম্মানিত ইমাম। আমি তার সম্পর্কে জানতাম। কিন্তু আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তখনও পর্যন্ত ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানতে পারি আমরা কতটা অভিন্ন।

আমার বাবার সঙ্গে এখনও পর্যন্ত হিজাব পরা অবস্থায় আমার দেখা হয়নি এবং এখনও পর্যন্ত আমার স্বামীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়নি। আমরা একটি পরিবার হিসাবে বাবার কাছে যাচ্ছি। যদিও আমি কিছুটা নার্ভাস অনুভব করছি। আমার বাবা কি বলবে সে সম্পর্কে আমি ঠিক নিশ্চিত নই এবং তিনি কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবে সে সম্পর্কেও আমি নিশ্চিত নই।

হৃদয়ের রক্তক্ষরণ : চাই বিশ্বাসের সংশোধন

(এক)

বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আবর্তিত হচ্ছে তা হল গণতন্ত্র। একটি অভিজাত শব্দ বটে। সারা বিশ্বে ক্ষমতার রদ-বদলের জন্য গণতন্ত্র শব্দটি বহুল পরিচিত। আমাদের দেশের গণতন্ত্রের বাস্তবতা হল রাজনৈতিক দলগুলো লাভজনক পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। নির্ধারিত দিনে নির্বাচন কমিশন ভোট গ্রহণের আয়োজন করে, যে পক্ষ বেশী ভোট পায় সে পক্ষ জয়যুক্ত হয় এবং সরকার গঠন করে। এটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতার রদ-বদলের সহজ ফর্মুলা। নব্বইয়ের দশকে দেশে গণতন্ত্র স্থিতিশীল রূপ লাভ করে বলে ধারণা করা হয়। তখন থেকে মানুষের মধ্যে সম্মান-শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি উঠে যেতে থাকে। সমাজে বহু দলীয় গণতন্ত্রের নামে বিভাজন শুরু হয়। এমনকি সেনা শাসকদের আমলে যারা সহজ সরল জীবন-যাপন করত পর্যায়ক্রমে তারাই নেতা বনে গেল! ফলে সমাজ প্রধান, শিক্ষক ও গুণীজন কারোই মান থাকল না। হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ভোরে শেফালী ফুলের মন মাতানো সৌরভও আর সুরভী ছড়ায় না। শীতে গভীর রাতে ইসলামী জালসা শেষে মহিষ যবেহ করে খিচুড়ি খাওয়ার আমেজও আজ আর চোখে পড়ে না। নেতারা বলেন, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। অথচ ঐ নেতারাই জনগণ পুড়িয়ে মারে, পিটিয়ে মারে, তাদের গাড়ি ও দোকান-পাট ভাঙে অতঃপর জেলে ঢুকায়; জনগণ শুধু চেয়ে দেখে আর নীরবে-নিভৃতে চোখের জল ফেলে! বিরোধী দল যখন ক্ষমতায় যাবার জন্য সংগ্রাম করে তখন বলে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছি। আবার সরকারী দল সেই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বিরোধী দলের উপর চালায় দমণপীড়নের স্টীমরোলার।

ভারত ভাগ হবার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই অর্ধ শতাব্দীকে 'রাজনীতির শতাব্দী' বলা যায়। কেননা রাজনীতি একটা লাভজনক ব্যবসা। সমাজের বুদ্ধিমান ধান্দাবাজরা রাজনীতির প্রথম স্তরের খাদক। দলীয় ভিত্তিক রাজনীতির কেন্দ্রীয় আদর্শ থাকে বটে, কিন্তু নীচের স্তরের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটা মানুষ কেন রাজনীতি করে? কারণ সাধারণ জনগণ রাজনীতিতে যোগ দেয় নিরাপত্তার জন্য। দেশের সমাজ ও প্রশাসন জনগণের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে অক্ষম বিধায় নিরাপত্তার স্বার্থে মানুষ রাজনীতিতে যোগ দেয়। তাছাড়া দলীয় সংগ্রামের ইতিবাচক ইতিহাসও দলে ভিড়তে সাহায্য করে। এ ছাড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মিছিলে যাওয়া বা দলীয় কার্যক্রমে কিছু পয়সা, খাবার পাওয়ার লোভে বা ভয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। ছাত্ররা হলে ছিট পাওয়া ও ভবিষ্যৎ নেতা হওয়ার স্বপ্ন, পাস করে সরকারী চাকুরী পাওয়ার উদগ্র বাসনা ও লালসা, ঠিকাদারী, অস্ত্র-মাদক ব্যবসার জন্য।

ব্যবসায়ীরা ঋণ মওকূফ, নতুন ঋণ গ্রহণ, নতুন ট্রেড লাইসেন্স ও ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া এবং সন্ত্রাসী মামলা থেকে মুক্তির জন্য রাজনীতিতে প্রবেশ করে। এজন্য তারা হাযার কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। আমলারাও নিরাপত্তা ডেপুটেশন লোভনীয় পদের কর্তা হবার জন্য রাজনীতির বিষবাষ্পে প্রবেশ করে। অর্থাৎ শার্প ব্রেইনের জনগণ নিজেদের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির জন্য রাজনীতি করে। মুনাফা, জমি ও পদোন্নতি দফায় দফায় বাড়ে। কি চমৎকার ডীড! এইতো তথাকথিত বর্তমান গণতান্ত্রিক রাজনীতির হালচাল। অন্যদিকে রাজনীতিবিদরা কেন্দ্র হতে তৃনমূল পর্যন্ত এমন ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় ক্যাডার বাহিনী তৈরি করে যে, তারা তাদের হাতে তুলে দেয় লাঠি, ইট-পাটকেল, বোমা-আগ্নেয়াস্ত্র। দেশের যেকোনো স্থানে যে কোন সময় ভাংচুর, অগ্নি-সংযোগে করে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা চালিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে! তখন আমলা, প্রশাসন, পুলিশ কারো কিছুই করার থাকে না। এভাবেই আইন, ঐতিহ্য ও ধর্মকে মুখের উপর পাড়া দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাণ্ডব চালায়। আর সরকারী দল হলে তো কোন কথাই নেই, রয়েছে প্রশাসনের প্রহরা।

(দুই)

গণতন্ত্রে বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনা করবে, সরকার পরিচালনায় ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে এটাই সাংবিধানিক নিয়ম। অথচ বিরোধীদলের নিকটে সরকারী দলের ভাল কাজও খারাপ এবং খারাপ কাজও খারাপ। ক্ষমতায় যেতে না পারলে শুরু থেকেই সরকারকে অবৈধ ঘোষণা করা যেন মজ্জাগত দোষ। কোন ভাল কাজের প্রশংসা তো নেই, কোন গঠনমূলক সমালোচনাও নেই। অন্যদিকে সরকারী দলও নিজেকে প্রভু মনে করে। কারো সমালোচনা তোয়াক্কা করে না, নিজেদের গতিতেই চলে। ফলে বিরোধীদল উপায়ন্তর না দেখে হরতাল-অবরোধের মত ধ্বংসাত্মক পথ বেছে নেয়। বিরোধী দলে যোগ্য ব্যক্তি থাকলেও সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ থাকে না। যদিও পশ্চিমা বিশ্বে এরকম সুযোগ দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ এখানে সরকারী দলের প্রশংসা করে পদ হারানোর ঝুঁকি থাকে। গণতন্ত্রে মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা আছে বিধায় ব্যঙ্গের ছাতার মত নানা মতাদর্শের নানা দলের আবির্ভাব ঘটে থাকে। দলে এদেশে দলের কোন অভাব নেই। বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিষবাষ্পে জাতীয় ঐক্যতো দূরের কথা বরং আমরা পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়েছি। অন্যদিকে সরকার ও বিরোধী দলকে দমনের নামে নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি হয়। বিদেশীরাও নতুন বিরোধী দল তৈরি করে। এছাড়া সুবিধা বঞ্চিতরাও দাবী আদায়ের লক্ষ্যে বিরোধী দল তৈরি করে। আমাদের দেশের রাজনীতি সত্য-মিথ্যার রাজনীতি। কেউ সত্যও বলেন না আবার সম্পূর্ণ মিথ্যাও বলেন না। ক্ষমতার জন্য খুন-গুম-অগ্নিসংযোগ-ভাংচুর-প্রাণী হত্যা-যানবাহন-দোকান বিনষ্ট করা ইদ্যাদি যেন ছেলেখেলার মত। বিদেশী প্রভুদের বাণিজ্যিক স্ট্রাটেজিক সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা লাভ করতে তারা পিছপা হয় না। উদ্ভব হয় কালোটাকার বাহুল্যতা। ফলে টাকার জোরে ভোট ক্রয় এম পি হন। শুরু হয় দৌরাত্মের সীমাহীন পদচারণা।

(তিন)

এই বিরোধী দলই ক্ষমতায় এসে সরকারী দল হয়। এরা সরকারে এসে আনুগত্যের বিচারে আমলাদের রদবদল করেন। নিয়োগ বাণিজ্যে ও দেশের বার্ষিক উন্নয়নের ঠিকাদারি কাজের কমিশন পেয়ে মন্ত্রীরা এম.পি বা রাতারাতি আঙ্গুলফুলে কলাগাছ হন। কর্মীদের মধ্যে একচেটিয়া কাজ বণ্টন করে প্রগতিবাদী এক ক্যাডার বাহিনীতে পরিণত করে। নিজ দলের ব্যবসায়ীদের ব্যাংক ঋণ পাবার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এবং সূদ মওকূফ করে ঋণ খেলাফি হবার সুযোগ করে দেয়। নতুন ট্রেড লাইসেন্স ও কর ফাঁকির সুযোগ দিয়ে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। কর্মকর্তারা দলীয় আনুগত্য করে সুবিধাজনক পদে বদলি বাগিয়ে নেন। যেন দেশটা একটা পাকা কাঁঠাল শেয়ালের দলেরা লুটেপুটে খায়। যেহেতু জনগণ একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য দলের শাসন মেনে নেয়। তাই দলীয় শাসনের নেতিবাচক দিকগুলো চোখ বুজে সহ্য করে এবং বিরোধী দল তাদের পক্ষে ওকালতি করার ম্যান্ডেট লাভ করে। আবার বিরোধী দলের নায্য সমালোচনা সরকারী দল পুলিশ ও দলীয় ক্যাডার বাহিনী দিয়ে দমন করে। সরকারী দল ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য হত্যা-খুন-

গুম-মামলা-হামলার আশ্রয় নেয়। সরকারী ও বিরোধী দলের সংঘর্ষ বাঁধলে পরস্পর অবৈধ অস্ত্র ব্যবহার করে, এমনকি নির্বিচারে গুলি চালায় কিন্তু পুলিশ কিছুই বলে না। কারণ এরা সরকার দলীয় প্রগতিবাদী ক্যাডার। সরকার দলীয় স্বেচ্ছাচারী শাসন ও বিরোধীদলের অনৈতিক বিরোধিতার প্রতিকূলে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ আজ মৃতপ্রায়। ফলে দেশের রাজনীতি কখনো সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি ।

(চার)

রাজনীতির দাবি আদায়ের সবচেয়ে চূড়ান্ত ও কুখ্যাত পন্থা হল হরতাল। দাবি না মানলে হরতাল ডাকা হয়। হরতাল জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া একটা অত্যচার। হরতালের আগের দিন আবার গাড়িতে আগুন ও ভাংচুরের মাধ্যমে জানান দেয়া হয়। ফলে হরতালের দিন কেউ গাড়ি বের করেন না, দোকান খোলেন না। কেউ গাড়ি বের করলে ভাংচুর করে আগুন দেয়া হয়। ইদানিং যাত্রীভর্তি বাসেও পেট্রোলবোমা ছুড়ে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এতে বহু মানুষ পুরে মরে। সারাদেশের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। বিরোধী দল সগৌরবে বিবৃতি দেয়, 'হরতাল জনগণ মেনে নিয়েছে'। স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়েছে। অথচ জনগণ এগুলো কখনই চায় না। হরতাল তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় মাত্র। এছাড়া জনগণকে হরতালে বাধ্য করার জন্য রাস্তায় টায়ার পুড়িয়ে, পিকেটিং করে, রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে, রেল লাইন উপড়ে ফেলে হরতাল সফল করা হয়। তখন সরকার বিবৃতি দেয়, 'জনগণ হরতাল প্রত্যাখ্যান করেছে'। জনগণ নিয়ে এই যেসব খেলা চলছে এগুলো মূলতঃ গণতন্ত্রেরই একটা অংশ। অনেক সময় কঠোর আন্দোলনের অংশ হিসাবে লাগাতার অবরোধ বা হরতাল দেয়া হয়া। এতে করে জনগণের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। ফলে সুশীল সমাজ, বিদেশী কূটনীতিকরা অনেক সময় সরকারকে চাপ দিয়ে দাবি মানানোর চেষ্টা করে। অনেক সময় দলীয় নেতা-কর্মী খুন কিংবা কারাবরণ করলে হরতাল ডাকা হয়। সত্যি বলতে কি রাজনীতিবিদের নীতি পরিবর্তন করার কোন পদ্ধতি না থাকায় বিরোধী দল হরতালের মত ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী দেয়। অথচ কোন সরকারই হরতাল বাতিলের জন্য আইন পাশ করে না। কারণ সরকারী দলই যখন বিরোধী হবে তখন তারাও হরতাল দেবে। নব্বইয়ের পর হতে হরতাল-অবরোধের কারণে শিক্ষা-অর্থনীতি দৃঢ় অবস্থানে দাঁড়াতে পারেনি। হরতালে জ্বালাও পোড়াও চলে, মানুষ পুড়ে মরে, অথচ কেউ তাদের খোঁজ রাখে না। বরং একে অপরকে দোষারোপ করতে ব্যস্ত থাকে! কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ সব মানুষ হত্যা ও যানবাহন বিনষ্টের কোন বিচার মামলা হয় না। কি বিচিত্র রাজনীতি!!

(পাঁচ)

স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৪ বছর পরেও বিচার, পুলিশ ও প্রশাসন এই তিন প্রতিষ্ঠানের সেবা জনগণের দোরগোঁড়ায় এখনো পৌঁছতে পারেনি। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিচার বিভাগ এখনও ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া মূলনীতি অনুসরণ করে। পুলিশকে জনগণ ভয় করে। কিন্তু ঝামেলা এড়ানোর জন্য পুলিশের কাছে কেউ যায় না। এমনকি চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধের জন্যও সাধারণ জনগণ পুলিশের কাছে যায় না। পুলিশ বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতাদের আদেশ-নিষেধের খেদমত করতে ব্যস্ত। সরকারী দল মামলার আসামি নির্ধারণ করে এবং যামিন মঞ্জুরের নির্দেশনাও দিয়ে থাকে, যা খুব দুঃখজনক। বিরোধী দল দমন পীড়নের জন্য পুলিশ ব্যবহার করা হয়। পুলিশ সংস্কার নিয়ে কেউ কথা বলে না কারণ এই পুলিশ দিয়ে আগামীতে বিরোধী দল দমন করা হবে। পুলিশের বহু হয়রানিমূলক মামলায় সাধারণ জনগণ দিনের পর দিন বছরের পর বছর জেল খেটে থাকে, অথচ তাদের কোন ব্যবস্থা করে না। বিচার ব্যবস্থাও রাজনীতি প্রভাব মুক্ত নয় বিধায় জনগণ ন্যায়বিচার পায় না। সাক্ষীরা নিরাপত্তার ভয়ে সাক্ষ্য দেয় না। এছাড়া যামিন বাণিজ্য ও এটা নিয়ে রাজনীতি বর্তমান বিচার ব্যবস্থার একটা 'প্রথা' হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা গোপনীয় কোন বিষয় নয়। যে আদালতে ন্যায়বিচার পেতে গেলে সর্বস্বান্ত হতে হয় সেই ব্যবস্থা ২১ শতকে এই আধুনিক সভ্যতার যুগে জনগণের কি কল্যাণ আনতে পারে? যেখানে রিক্সা চালকের ধর্ষিত কন্যার ন্যায়বিচারের জন্য সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত লড়তে হয়। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তার কি কোন ব্যবস্থা আছে? নিরপেক্ষ নির্বাচন সব দলেরই কাম্য। অথচ নির্বাচনের সময় নিরপেক্ষতায় সন্দেহ আছে বলে কেউ কাউকে সমর্থন করে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য হল নিরপেক্ষ ও কার্যকারী একটা নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন নিয়ে কখনও কোন দল কাজ করে না। বরং সবাই ফাকা মাঠে গোল দিতে চায়!

(ছয়)

সংবাদপত্র মত প্রকাশের একটি মাধ্যম। বরং এটি একটি সাংবিধানিক অধিকার। এই সুযোগে দেশে সংবাদপত্রের বাহুল্যতা অনেক বেশী। ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার স্বার্থে এবং রাজনীতিবিদরা তাদের রাজনীতির স্বার্থে সংবাদপত্র প্রকাশ করে। বর্তমানে সংবাদপত্র এদেশের একটি শিল্প। সবাই সবার দৃষ্টিকোণ হতে সংবাদ প্রচার করে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য নিরপেক্ষ সংবাদ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সংবাদপত্র রাজনীতিকদের রাজনীতি করার হাতিয়ার। কেননা সাংবাদিকরা কোন সংবাদ বাণিজ্যিক রঙে উস্কে দিয়ে দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে করতে কছুর করেন না। তাছাড়া সিন্ডিকেটেড সংবাদ পরিবেশন করে কারো বারটা বাজাতেও সময় নেয় না। অথচ সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ সকলেরই কাম্য।

(সাত)

বাংলাদেশে চলমান রাজনীতির পার্শ্ব অভিনেতা হিসাবে ইসলামী দলের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের ধর্মের প্রতি সহানুভূতি থাকায় ধর্মনেতারা তাদের ভক্ত ও সমর্থকদের নিয়ে বড় এক দল গড়ে তোলে। পরবর্তীতে রাজনীতি করার খায়েশ মাথায় ঢোকে। বড় রাজনৈতিক জোটভুক্ত হয়ে নিজেদের শক্তি, মন্ত্রী ও অর্থের দৃঢ়তা অর্জনের স্বপ্ন দেখে। তারা ইসলামী খেলাফতের শ্লোগান দিয়ে টুপি পাঞ্জাবী পরিহিতদের বিশাল শোডাউন দেয় অথচ ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ নির্ভেজাল তাওহীদকে বেমালুম ভুলে যায়। তারা তরীকা-মাযহাব-ফির্কায় বিভক্ত হয়ে যায়। যাদের সংখ্যা আবার ৬০/৭০টিরও কম নয়। এরা নিজেদেরকে একমাত্র সঠিক দল (!) হিসাবে জাহির করে। অথচ এরা আজ আন্তঃদলীয় কোন্দল ও রেষারেষিতে ঘুনেধরা বাঁশের মত সংখ্যালঘু দুর্বল শক্তি। এরা বড় দলকে ব্যবহার করে বিপক্ষ দলকে জেল-যুলুম নির্যাতন করতে পিছপা হয় না। ফলে ইসলামী দলের ফাঁকা ইসলাম ক্বায়েমের ফাঁকা বুলি আজ আর জনগণ বিশ্বাস করে না। ক্ষেত্র বিশেষে এদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলামী দল হতে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। যা খুবই দুঃখজনক। আমাদের জনগণ ও ইসলামী দলগুলোর দল করার ও মানার জাতীয় স্ট্যান্ডার বা মান না থাকায় ইসলাম নিয়ে ব্যাখ্যার শেষ নেই। ফতোয়া কার্যকর ও জঙ্গী তৎপরতার উত্থান লক্ষ্য করার মত, যা কারোরই কাম্য নয়। অন্যদিকে পীর-ছূফীবাদ ও বৈরাগ্যবাদের চর্চাও লক্ষ্যণীয়।

(আট)

বৈদেশিক শক্তি বাংলাদেশের রাজনীতির পরিবর্তনের বড় এক নিয়ামক। বিরোধী দলের আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে তারা বিদেশী

শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। অনেক সময় ফল ভালো হয়। আবার কখনো নিশ্চিহ্নও হয়ে যায়। এই শক্তি সরকারকে দাবি মানাতে বাধ্য করে; ক্ষেত্র বিশেষে গদিও উল্টে যায়। এদেশের রাজনীতির জাতীয় মানদণ্ড না থাকায় কেউ কাউকে মানে না। বাধ্য হয়ে বিদেশী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে ভারত, আমেরিকা, জার্মান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্য। এছাড়া সঊদী আরব, পাকিস্তান, চীন, ইরান ও রাশিয়া ইত্যাদি দেশেরও ভূমিকা আছে চোখে পড়ার মত। সংবাদিকরাও দেশের সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করে এদেশের অভ্যন্তরে নাক গলানোর সুযোগ করে দেন। অর্থ, মিডিয়া, বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করে সরকার পরিবর্তনে বাধ্য করে এসব রাষ্ট্র। অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর স্বার্থ বাড়তে থাকায় এদেশের রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে সবাই ব্যস্ত। এছাড়া আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতির জন্যও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ।

সুধী পাঠক! দেশের ভঙ্গুরপ্রায় এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সাধারণ ও নিরপেক্ষ মানুষের হৃদয় আজ হাহাকার করছে। রক্তক্ষরণ হচ্ছে হৃদয়ের রক্তকণা থেকে। হৃদয় উদ্বেলিত অব্যক্ত আর্তনাদ নীরবে-নিভৃতে গুমরে মরছে। এভাবেই কি চলতে থাকবে দেশ? হরতাল-অবরোধ ও পেট্রোলবোমার আঘাতে এভাবেই কি সাধারণ মানুষ জীবন দিতে থাকবে? অগ্নিদগ্ধ মানুষের আর্তচিৎকার ও যালেমের বিরুদ্ধে মাযলূমের বুকফাঁটা ফরিয়াদ কি তাদের বিবেকের দরজায় করাঘাত করবে না! রাজনীতিবিদরা কি এভাবেই দেশের সম্পদ লুটপাট করে খাবে? ছাত্র ও তরুণ যুবকরা কি বিজাতীয় মতাদর্শের হিংস্র শিকারে পরিণত হতে থাকবে? রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড সদৃশ অর্থনীতি কি বিপর্যস্ত ও পঙ্গু হয়েই থাকবে? অতএব এই মুহূর্তে প্রয়োজন মানুষের বিশ্বাসের পরিবর্তন ও সংশোধিত কর্মের যথাযথ বাস্তবায়ন। বিশ্বাস জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনই পারে সহিংসতার পরিবর্তে শান্তির সমাজ উপহার দিতে। আর সে বিপ্লব হতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অভ্রান্ত প্লাটফরমকে একনিষ্ঠতার সাথে আঁকড়ে ধরা এবং সে অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

বাঙালি কেন পাঠক নয়

-এস এম তারিক হাসান
সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
পাবনা সাংগঠনিক যেলা

অভাব শব্দটি বাঙালির জীবনের সাথে চুইংগামের মত লেগে আছে। প্রতিদিন সকাল হতে না হতেই অন্নচিন্তা সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে জায়গা করে নেয়। আকাশছোঁয়া অভাবের সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকতে পারে না পাঠক মন। অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রথম ইটটি নির্মাণের জন্য তাই বাঙালি উদগ্রীব। বি.এ, এম.এ পাশ করে বাঙালির সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় চাকুরী। বিসিএস বড় ক্যাডার হওয়া, ব্যাংক কিংবা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকুরি গ্রহণ কিংবা কোন কলেজে অধ্যাপনা করার বিষয়টি তখন তার মাথায় উকুনের মত কামড়াতে থাকে। বাঙালি তখন অস্তিত্ব সংকটে ভোগে, নিজের বাঁচা মরার লড়াইয়ে নিজেই হয়ে পড়ে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। পেটে অন্ন না থাকলে বিদ্যাসাগরের বিদ্যার কথা তার কাছে পানসে মনে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখা একজন ছাত্র-ছাত্রীর প্রথম ও প্রধান চিন্তা হল নিজে কিভাবে বেঁচে থাকবে, একজনের খরচ প্রতিমাসে কত হবে, তার পরিবার তাকে কতটুকু যোগান দিতে পারবে, সে কিভাবে নিজের খরচ জোগাবে ইত্যাদি। এমনটি ভাবতে ভাবতেই তার রাত কেটে যায়। তার কাছে প্রতিটি রাত যেন হতাশার, প্রতিটি ক্ষণ ব্যর্থতার, প্রতিটি পদক্ষেপ ভীরুতার। অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে ভুগতে একজন ছাত্র-ছাত্রীর মন চুপসে যাওয়া বেলুনের মত হয়ে যায়। তখন তার মন পদ্মপাতার নীরের মত দোদুল্যমান হয়ে যায়। অর্থনৈতিক বাধা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে সে হয়ে পড়ে নাজুক, লাজুক, ভীরু ও নিঃসঙ্গ আত্মার এক ব্যর্থ মানুষ। সে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যায়। ব্যর্থতার গ্লানি এসে তার চাওয়া-পাওয়াকে নস্যাৎ করে দিয়ে যায়। যদিও সমুদ্রের মাঝে জেগে ওঠা চরের মত আশা তার জীবনকে কিছুটা স্পন্দিত করে। তবুও আশা সেতো মরীচিকা!

দেশের অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সিংহভাগই মফস্বল এলাকার। এরা এদের মেধা, শ্রম ও সাধনার বিনিময়ে চলে আসে দেশের বিখ্যাত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করার জন্য। কিন্তু এখানে আসার পর তার স্বপ্ন পরিণত হয় দুঃস্বপ্নে। অভাব নামক শিকল তাকে বেঁধে ফেলে আষ্টেপৃষ্ঠে। সে হয়ে পড়ে বলির পাঠা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে দেখেছি ছাত্র-ছাত্রীদের অভাবের ক্ষেত্রসমূহ। কত ছাত্রকে একবেলা, দু'বেলা না খেতে দেখেছি। এর ভিতর দিয়ে তারা কষ্টে দিনাতিপাত করছে। কত ছাত্র ছাত্ররাজনীতির গিনিপিগে পরিণত হয়েছে। নেতারা কিভাবে তাদেরকে ব্যবহার করে নরপশু বানিয়ে ফেলেছে। রাজনীতির বুমেরাং-এ পরিণত হওয়া এই সহজ-সরল ছেলেগুলো রাজনীতির ফাঁদে পড়ে জীবনের প্রথম ধাপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, অহরহ হচ্ছে। দূষিত আবহাওয়ায় অভাবের পাশাপাশি জায়গা করে নেয় রাজনীতির ভয়াল থাবা। ভয়ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে মফস্বল থেকে আসা ভ্যাবাচেকা খাওয়া যুবারা। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগে রাজনীতির বোদ্ধারা তাদেরকে সহজ শিকারে পরিণত করে। রাজনীতির কারেন্ট জালে তারা ট্যাংরা মাছের মত আটকে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে বিভিন্ন দলের, বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন পথের ছাত্র-ছাত্রী থাকে। ক্ষমতাসীন দলের পাতা টোপে তাদের নাস্তানাবুদ অবস্থা। বিরোধী দলের কেউ থাকলে সে হয় নির্যাতিত, নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপমানিত, অবহেলিত কিংবা ঘৃণিত। স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা তার লোপ পেতে পেতে শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে জাতির বিবেক কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা। কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছিল। আমাদের সমাজে বহু কাবিল রয়েছে হাবিলকে হত্যা করার জন্য। একদিকে অর্থনৈতিক দৈন্য অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তরে ঘৃণার বীজ বপন করে।

একটি বিষয় লক্ষণীয়, অনার্স-মাস্টার্স পড়া একজন ছাত্র-ছাত্রী তার পাঠ্য সিলেবাসের সীমা-পরিসীমার বাইরে যেতে অসম্মতি জানায়। পাঠ্যের বাইরের কিছুকে জানা-বোঝার বিষয়টি তার কাছে নিষিদ্ধ গন্দম ফলের মত মনে হয়। তাকে 'প্রথম শ্রেণী' পেতে হবে এই চিন্তায় তার অস্থিরতা কম পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দারুণভাবে হতাশ করে। ক্ষুদ্রকে আঁকড়ে ধরার এই প্রবণতাই মেধাবীদের সব চেষ্টাকে নিষ্ফল করে দেয়। তাদের জগৎ ছোট হয়ে যায়, তারা হয়ে পড়ে মানসিক বিকারগ্রস্ত মানুষ। এদের কাছে পড়ুয়ারা হয়ে পড়ে পাগলাটে স্বভাবের ধুরন্ধর যুবক-যুবতী কিংবা ইঁচড়ে পাকা অবাধ্য সম্প্রদায়। প্রথম শ্রেণী না পেলে বাবা-মা বাড়িতে জায়গা দেবে না এরূপ মন-মানসিকতার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। এদের পাঠ্যবইপ্রীতি চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার পর দেখা যায় যে এরা

এদের আম ও ছালা দু'টিই হারিয়েছে। অল্পের জন্য প্রথম শ্রেণী পাওয়া হয়নি আবার বাইরের জ্ঞানের চৌহদ্দিকেও স্পর্শ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়নি। এই ধরনের ছাত্র-ছাত্রী তখন না পায় ভাল কোন সরকারি চাকুরে। না পারে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে। তখন হতাশা তাদের মজ্জা খেয়ে ফেলে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা তখন তাদের কাছে মনে হয় বোকাদের খেলা। অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের দেখেছি যারা সারাদিন আড্ডা দিয়ে বেড়ায় অথচ বই পড়তে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করলে প্রত্যুত্তরে তারা তুচ্ছের হাসি হেসে বলে, 'পড়ে কী লাভ? পড়ে কি কেউ বড়লোক হয়েছে'? এরা সবাই ঝড়ে বক শিকার করতে অভ্যস্ত। কিন্তু এরা জানে না যে, মন বড় করার জন্য বই পড়তে হয়, জীবনের সাফল্য পাওয়ার জন্য বইয়ের কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে প্রতি বছর হাযার হাযার গ্রাজুয়েট বের হচ্ছে। এদের সিংহভাগই বেকার। যে আশা-প্রত্যাশা নিয়ে এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ি জমায় তা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা চুকিয়ে ফেলার পর ব্যর্থতায় রূপ নেয়। তখন তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দুর্বোধ্য হয়ে যায়। হতাশা তাকে কুরে কুরে খায়। বিসিএসের পিছনে লাগামহীন দৌড়ের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাংক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানিতে ধরনা দিতে দিতে ছাত্র-ছাত্রীরা রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বাইরের বই পড়ে নিজের জ্ঞানের থলি ভারী করার প্রশ্নই আসে না।

আমাদের দেশের শিক্ষা একাডেমিগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক। আমি দেশের শীর্ষস্থানীয় দু'টি একাডেমি সম্পর্কে বলব। কিছুদিন আগে গেলাম বাংলা একাডেমিতে কয়েকটি বই কিনব বলে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ। বাংলা একাডেমির বইয়ের তালিকা থেকে কিছু বইয়ের নাম লিখলাম। বিপণন কেন্দ্র থেকে আমাকে জানানো হল যে, 'বই স্টকে নেই। সবগুলি শেষ'। আমার পায়ের নিচে মাটি নেই। অতঃপর অনুমতি নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম এবং দেখলাম যে বইয়ের তাকগুলো খালি। আর যে বইগুলো দেখলাম তাতে আমার মনে হল হাযার বছরেও কোন হাত এই বইগুলোকে স্পর্শ করেনি। আমি হতাশ হয়ে কিছু বই হাতড়াতে লাগলাম। উদ্ধার করলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী 'ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা স্মারক গ্রন্থ' আর পেলাম বাংলা একাডেমীর প্রথম পুরস্কার বিজয়ীর নামের সারিতে থাকা অন্যতম নাম 'মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফি আল-কুরায়েশীর জীবনী গ্রন্থ'। হায়রে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা! কি নাজুক! বিপণন কেন্দ্রে এরকম প্রশ্ন করে সদুত্তর খুব কমবার মিলেছে। বাংলা একাডেমি থেকে গেলাম ইসলামিক ফাউন্ডেশনে। সেখানকার অবস্থা আরও নাজুক। আমি তেরোটি বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে গিয়ে দেখি সেখানে একটি বইও নেই। বিষণ্ন মন নিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম, 'নেই কেন'? বোয়াল মাছের দেঁতো হাসি দিয়ে তো একজন বললেন যে, 'বইয়ের প্রিন্ট শেষ'। সরকারী সহযোগিতা না-কি তাদের কপালে জুটছে না। পাঁচ কোটি টাকা বাজেট হলে না-কি সরকারি অনুদান পাওয়া যায় মাত্র কয়েক লাখ টাকা। এই হল আমাদের শিক্ষার হালচাল। এখন কি একথা অস্বীকার করার কোন উপায় আছে যে, আমরা রুগ্ন জনগোষ্ঠী নই?

আমাদের দেশে যারা ভাল পাঠক এদের অধিকাংশই গরীব। প্রচুর বই কেনার সামর্থ্য নেই। কিন্তু এদের বই পড়ার ইচ্ছা প্রবল, সমাজকে ইতিবাচক পরিবর্তন করার জন্য এদের চেষ্টা অব্যাহত। কিন্তু বইয়ের বাজারে ঢুকে এরা প্রবলভাবে আশাহত হয়। মাটির সাথে মিশে যেতে থাকে এদের অবস্থান। বইয়ের দাম আকাশছোঁয়া, সাধ্যের সীমা-পরিসীমার বাইরে। অগত্যা কষ্টে বই কিনতে হয় মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাধা আসে তখন, যখন দেখা যায় বই ফটোকপি করতে করতে একেবারে সস্তা করে ফেলা হয়েছে। মূল বইয়ের সাথে সস্তা ফটোকপি বইগুলোর অনেক সময় আদ্যোপান্ত খুঁজে বের করা যায় না। যেমন ধরুন মাস তিনেক আগে নীলক্ষেত থেকে Michael H. Hart এর বিখ্যাত The Hundred গ্রন্থটি কিনলাম। মাস তিনেক আগে কিনেছিলাম এর অনুবাদ গ্রন্থটি। মাদার তেরেসার জীবনী অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখি অনুবাদ গ্রন্থে ঘাবলা আছে। মূল বইয়ের সাথে এখানে বিশ্বখ্যাত ১০০ জন ব্যক্তির নামের মিল খুব কমই আছে। মূল বইয়ের বহু নাম বাদ দিয়ে সেখানে দেওয়া হয়েছে ফটোকপি বইয়ের সম্পাদকের পসন্দ অনুযায়ী অনেকগুলো নাম। বইয়ের কাটতি বাড়ানোর জন্য এরূপ করা হয়েছে। এই হল আমাদের সস্তার অবস্থা। উপরন্তু বইপত্রের দাম কমানোর প্রতি প্রশাসন থেকে আশানুরূপ কোন ফল কখনও মেলেনি।

আমাদের দেশে মোবাইল সিম খুবই সস্তা। জাতি ধ্বংসের এটি একটি বড় কারণ। যে শিশু ছোটবেলা থেকে বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে সে শিশু এখন মোবাইল ফোন, ভিডিও গেম, কম্পিউটার দেখে আকৃষ্ট হয়। তাই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বাচ্চারা বালিশের নিচে থাকা মোবাইল ফোন খুঁজতে থাকে। বইয়ের সাথে সখ্যতা তৈরি হবে কিভাবে? বই পড়ে ইবনে খালদুন, আল রাজী, ডঃ যাকির নায়েক, বিল গেটস, স্টিভ জবস, আইনস্টাইন, প্রফেসর আব্দুর রাযযাক হওয়া যায় একথা বাঙালি খুব কমই বিশ্বাস করে। তা না হলে সব বাঙালির বাড়িতে একটি করে ছোট লাইব্রেরী থাকত। একজন ধনীর বাড়িতে বই পড়ার অভ্যাস না থাকলে, তার বাড়িতে বইয়ের আলমারি না থাকলে বুঝতে হবে এরা জ্ঞানের রাজ্যে খুবই গরীব। এদের জন্য খুব করুণা হয়। আবার বাজারে অনেক বই রয়েছে যেগুলোর দাম অনেক চড়া। গরীব মেধাবী পাঠকের কাছে এটা আকাশছোঁয়া। নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়ার অবস্থা যাদের, তাদের পাঠক হয়ে ওঠার গল্প খুব আজগুবি মনে হতে পারে।

আমাদের দেশের খুব কম সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন যারা পাঠ্য-পুস্তকের বাইরে পড়াশুনা করেন। পিএইচডি ডিগ্রি গ্রহণের পর অনেকেই পড়াশুনা ছেড়ে দেন। এখানে একটি কথা স্মর্তব্য, ট্রিনিটি কলেজের এক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করে জনৈক অধ্যাপককে বলেছিলেন যে, তার জ্ঞান অর্জন করা শেষ। তখন শিক্ষক বলেছিলেন, 'তোমার জ্ঞান অর্জন শেষ আর আমার জ্ঞান অর্জন শুরু'। বোকাদের জ্ঞান অর্জন এভাবেই শেষ হয়ে যায়। নবীনদের চিন্তা চেতনায় আজ চিড় ধরেছে, যার কারণে তারা নীতিভ্রষ্ট হচ্ছে। বি.এ, এম.এ পাশ করে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে চাকুরির বাজারে। পেট সামাল দিবে না-কি পিঠ সামাল দিবে এটাই তাদের মূল চিন্তার বিষয়।

বাংলাদেশের অন্যতম জ্ঞানতাপস প্রফেসর আব্দুর রাযযাক যখন কোন দেশে যেতেন তখন সেখানে দু'টি বিষয় অবলোকন করতেন। (এক) সে দেশের কাঁচা বাজার (দুই) সে দেশের বইয়ের দোকান। এ দু'টি বিষয় দিয়ে তিনি সে দেশের অর্থনীতিকে মূল্যায়ন করতেন। আমাদের দেশে অনেক কাঁচাবাজারে এখন টইটম্বুর অবস্থা বিরাজ করলেও বইয়ের দোকানগুলোর অবস্থা যে খুব নাজুক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যুবক-যুবতীদের মন যতক্ষণ না ফেসবুকের ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে বইয়ের রাজ্যে বিচরণ করছে, পকেটের টাকা যখন বইকেনার পরিবর্তে সিগারেট কিংবা চুইংগাম অথবা ইন্টারনেটের এমবি কেনার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাঙালির পাঠক হয়ে ওঠা অসম্ভব।

-মেহেদী আরীফ
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সাকা হাফং-এর পথে

আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

খুম থেকে খুমেতে..

৪র্থ দিন সকাল। ফজরের ছালাত সেরে হালকা বিশ্রাম নিয়ে সকালের নাস্ড়া করে রেডি হয়ে গেলাম। শুনলাম আজ থেকে আমাদের কষ্ট কমবে। তাই মেজাজ বেশ ফুরফুরে। পাহাড়ী কলা আর ঢাড়স সাইজের আনারস কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে সাড়ে ৮-টার দিকে বেরিয়ে গেলাম গতদিনের দলটির সাথে। লোকজন বেশী হলে বেশ মজা হলেও প্রকৃতিকে একান্তভাবে দেখার সুযোগ কমে যায়। যাইহোক আজ থেকে কেবল নামারই পথ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। হাঞ্জরাই পাড়া হয়ে দু'তিনটি পাহাড় অতিক্রম করে নয়াচরণ পাড়ায় চলে আসলাম। এখান থেকে পথ পরিবর্তন করে বুলংপাড়ার দিকে এগোতে লাগলাম। রেমাক্রি খালের কুল দিয়ে যেতে যেতে বার বার বলছিলাম আর যেন পাহাড় চড়তে না হয়। আমার আকুতি শুনেই কিনা জানিনা। হঠাৎ ঐ দলের গাইড বেলাল ভাই বুলংপাড়ার দিকের পাহাড়ী রাস্তায় না গিয়ে খাল পাড় ধরেই আমাদের গন্তব্য মাথামারাখুমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত দিলেন। অতিরিক্ত গাইড হিসাবে এ এলাকার দু'জনকে সাথে নিয়ে নিলেন। এবার শুরু হ'ল আরেক এ্যাডভেঞ্চার। খুব অল্প মানুষ এ পথ মাড়ানোয় পথের চিহ্ন বিলীন হওয়ার পথে। কোন কোন স্থানে গাছের গুড়ি ধরে হাটতে হ'ল। দু'একবার পথ না চেনার কারণে দাড়িয়েও যেতে হ'ল। কোথাও কোথাও পথ সংকুচিত হয়ে খাল থেকে সরাসরি খাড়া পাহাড় উঠে যাওয়ায় খাল পার হয়ে অন্য পাশ দিয়ে হাটতে হচ্ছিল। খাল পার হওয়া আরেক হ্যাপা। স্রোত অল্প থাকলেও একাধিক স্থানে পরস্পরের হাত ধরে পার হতে হচ্ছিল ভেসে যাওয়ার ভয়ে। খালটির একটি দারুণ বৈশিষ্ট্য হ'ল কোনদিকে খাড়া পাহাড় থাকলে অপর পাশে হাটার মত সমতল কিছু যায়গা রেখে পাহাড় শুরু হয়েছে। তাই আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে খাল-পাহাড়ের মিলনস্থল দিয়ে দারুন উপভোগ্য এক ট্রেকিং শেষে সাড়ে ১১-টা দিকে আমরা মাথামারাখুমে পৌঁছালাম। এ স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া আমার কম্ম নয়। এটুকু কেবল বলতে পারি যায় যে, দু-পাশে অদ্ভুতভাবে খাঁজ কাটা উঁচু পাহাড়। মাঝখানে নিটোল

সবুজাভ পানি। পাথরভর্তি খালটির গতিপথে হঠাৎ গহীন জঙ্গলে প্রকৃতির এমন বিচিত্র রূপ দেখে সবাই কিংকর্তব্যবিমুঢ়।

বেশ খানেকটা সময় কাটিয়ে পুরো পাথরে পরিণত হওয়া পাহাড়ের ধার ঘেষে এগিয়ে যেতে লাগলাম সাতভাইখুমের দিকে। মাঝে দু'একটি পাহাড় টপকাতে হলেও বেশী কষ্টকর ছিল বড় বড় পাথর অতিক্রম করা। কোন পাথর থেকে কোন পাথরে লাফ দিব তা ঠিক করা ছিল আরেক বিপদ। কোন কোন স্থানে খাজ খাজ পেণ্টগুলি এমন সরু হয়ে এসেছে যে মনে হচ্ছে পার হওয়াই সম্ভব নয়। যাইহোক বেলা ১-টা দিকে উঁচু একটি পাহাড় থেকে একস্থানে নেমে দেখি চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা স্থানটি মাঝে বিশাল বিশাল পাথর আর চারিদিক দিয়ে জলপ্রপাতের প্রবাহ। ঝুকিপূর্ণ হলেও বিস্ময়ে-আনন্দে সবাই এ পাথর থেকে সে পাথর লাফালাফি শুরু করে দিল। সাতটি বিশাল সাইজের পাথর একত্রিত হওয়ার কারণে নাকি স্থানটিকে সাতভাইখুম। ঐ দলের একভাই লাফ দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পানিতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলেও সাথী ভাইয়ের সাহায্যে উঠে আসল। কিন্তু পকেটে থাকা ক্যামেরাটি ততক্ষণ পানিতে ভিজে শেষ। কয়েকটি বড় বড় পাথর পার হয়ে এবার উপস্থিত হলাম ভেলাখুমে। বাঁশের ভেলায় চড়ে এ খুমটি পার হতে হবে। একটু আগে একটি গ্রুপ খুম পার হওয়ায় ওদের নির্মিত ভেলাটি এখনো রয়ে গেছে। তাই আমাদের কাজ কমে গেল।

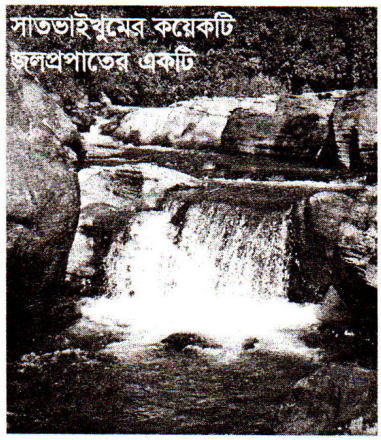

ভীতিকর খুমটির দু'পাশে খাড়া হয়ে নেমে যাওয়া হাযার ফুটের পাহাড়। মাঝে ১০-১৫ ফুট চওড়া সবুজ শীতল পানির আঁধার। শুনলাম এর গভীরতা সম্পর্কে পাহাড়ীরাও অজ্ঞাত। সূর্যের আলো এখানে সামান্যই প্রবেশ করে। সাতার শিখেছি বেশী দিন হয়নি। তাই বাঁশের নড়বড়ে ভেলায় পার হওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তার পালে বিরাট হাওয়া লাগল। দক্ষ সাতারু কাফী ভাই অবশ্য যথারীতি অভয় দিয়ে যাচ্ছেন। তিনটি লাইফ জ্যাকেট ছিল সহযাত্রীদের সাথে। তাদের কাছ থেকে জ্যাকেট ধার নিয়ে ভয়ে ভয়ে ভেলায় চড়ে বসলাম। বিশাল সাইজের পলিথিনে আমাদের ব্যাগগুলি ভরে নিয়ে ভেলায় নেওয়া হ'ল। খুমে প্রবেশ করতেই মনে হ'ল হঠাৎ যেন কোন পাথুরে দুর্গে প্রবেশ করলাম। বাকরুদ্ধ হয়ে দেখছি নিস্তব্ধ চারিপাশ। মাঝে

মাঝে ভেলা উচু-নিচু হওয়ায় শীতল পানিতে আমার পায়জামা ভিজে যাচ্ছিল। ঠাণ্ডায় গায়ে কাটা দিলেও নড়ার কায়দা নেই। নড়বড়ে ভেলা যেন ডুবে যায় যায়। ১৫-২০ মিনিট চলার পর খুম পার হয়ে তীরে এসে ঠেকল ভেলা। নিরাপদে ফেরায় একবুক স্বস্তি নিয়ে সোল্লাসে লাফ দিলাম পাথরের গায়ে। পরমুহূর্তে পিচ্ছিল পাথরে পা হড়কে সোজা পানিতে। তীরের কাছে বুক পানি থাকায় বেঁচে গেলাম এযাত্রা। তারপর সেখানেই গোসল সেরে নিলাম। কিছুক্ষণ জিরিয়ে, কাপড় শুকিয়ে নিয়ে বিকাল ৪-টায় রওয়ানা হলাম আমিয়াখুমের উদ্দেশ্যে। একটু আগাতেই শুনি পানিপতনের ভীষণ শব্দ। এত কাছে আমিয়াখুম! এক দৌড়ে গাইডকে পিছনে ফেলে আমিয়াখুমের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বিশাল জলরাশি নিয়ে সাড়ম্বরে বয়ে চলা এই জলপ্রপাত আমাদের স্তব্ধ করে দিল। ভয়ংকর সুন্দর বুঝি একেই

আমিয়াখুম

বলে! ছবি দেখে আমরা আগে থেকেই নিশ্চিত ছিলাম এটাই বান্দরবানের সবচেয়ে সুন্দর জলপ্রপাত। কিন্তু আজ এ কি দেখছি! সুবহানাল্লাহ, কল্পনার চেয়ে বেশী সুন্দর। এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষ কেন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এই দুর্গম এলাকায় আসে তার অর্থ যেন খুজে পেলাম। মন্ত্রমুগ্ধের মত ক্ষণ কাল ব্যাপিয়া দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ গাইডের তাড়ায় কান খাড়া হল। শুনলাম রাত্রিযাপনের জন্য এখনো দু'ঘন্টার এক জংলী পথ অতিক্রম করতে হবে। এদিকে সন্ধ্যা হতে ১ ঘন্টাও বাকী নেই! সুতরাং আবার কোনদিন আসার প্রতিজ্ঞা নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলাম আতিরামপাড়ার উদ্দেশ্যে।

শুরুতেই কয়েক'শ ফুট খাড়া পাহাড়ী পথ। সারাদিন বেশ রিলাক্সেই এসেছি। শেষ বিকালের সুন্দর মুহূর্তে শ্বাসরুদ্ধকর এই পথটি আমাদের জন্য ভীষণ বিরক্তকর আপদ হয়ে দাঁড়ালো। চুড়ায় ওঠার পর দলের একেকজনের অবস্থা ছিল দেখার মত। হাত পা ছড়িয়ে ধপাধপ বসে পড়ছিল সবাই সবুজ ঘাসের বিছানায়। আমাদের গাইড অজিত তাড়াতাড়ি সবাইকে সঙ্গে বয়ে আনা পেপে, আনারাস আর খেজুর-পানি খাওয়ালো। ওদের সবার বেশ মন খারাপ। পলিথিন ফুটো হয়ে ব্যাগে পানি ঢুকে ওদের মোট ৫টি মোবাইল আর একটি ক্যামেরা নষ্ট হয়ে গেছে। দূর্ভাগ্যজনকই বটে। কিছুক্ষণ জিরিয়ে আবার যাত্রা। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ত্রিপুরাদের বাসস্থান আতিরামপাড়ায় পৌঁছাতে ৬-টা বেজে গেল। কিন্তু এখানে আবাসনের ভালো সুবিধা না পেয়ে হাটা ধরলাম থুইসাপাড়ার উদ্দেশ্যে। পৌনে ৭-টায় পৌছালাম থুইসাপাড়ায়। কারবারীর বাড়িতে আমাদের ১২ জনের জায়গা হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে চক্ষু চড়কগাছ। মাটির ঘরে দু'তিনটি ভাঙ্গাচোরা খাট বিছানো। তার উপর ত্রিপল বিছানো। পাশে চেয়ার টেবিল দিয়ে বসার ব্যবস্থা। সবমিলিয়ে পাহাড়ের বুকে রাজকীয় ব্যবস্থাপনাই বলতে হয়। ভেজা কাপড়গুলি মেলে দেওয়া হ'ল। মুরগী রান্না করার মত শারিরীক অবস্থা না থাকায় নুডুলস-স্যুপ মিক্স খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। গাইড বেলাল ভাই অল্প সময়ের মধ্যে তা রেধে ফেললেন। আমরা ছালাত সেরে বিপুল উৎসাহে খেতে বসলাম। খাওয়া শেষে বাইরে মোবাইল নেটওয়ার্ক খুঁজতে বের হয়ে দেখি চা-বিস্কুটের বেশ বড় দোকান। ট্রেকিং শুরু করার পর এই প্রথম কোন গ্রামে দোকান পেলাম। দুধ চা আর বিস্কুট খেলাম সেখানে। দোকানীকে এলাকার ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জানালো অনেক কথা। অর্থ-কড়ির লোভে পড়ে এলাকা অনেক লোক ইতিমধ্যে খৃষ্টান হয়ে গেছে। খৃষ্টান মিশনারীরা এনজিওগুলির সহায়তায় এখানকার মানুষের জন্য সম্ভবপর সকল সহযোগিতা করছে। গ্রামের একাধিক ছেলে-মেয়ে ঢাকা-চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র। কেউ লামার কোয়ান্টাম স্কুলে পড়ছে। এদের প্রভাবে মানুষ ধর্মান্তরিত হচ্ছে বেশ দ্রুতগতিতে। তার সাথে আলাপ শেষে খোলা আকাশের নিচে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করলাম।

কয়েকদিনের টানা ব্যস্ততার পর আজ রান্নার ঝামেলা না থাকায় একটু নির্ভার লাগছে। পাহাড়ের একটু উচু স্থানে উঠে বাঁশে মোবাইল ঠেকিয়ে নেটওয়ার্ক পাওয়ার চেষ্টা করলাম। শেষে ব্যর্থ হয়ে ঘরে চলে এলাম ঘুমাতে। বাড়ির বাইরেই খৃষ্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হচ্ছে। রামু থেকে কোর্ট-প্যান্ট-টাই ঝুলানো কেতারদুরস্ত খৃষ্টান মিশনারী এসেছে ধর্মোপদেশ দিতে। ৪ ঘন্টা গাড়িতে আসলেও তাকে অন্তত ৩ ঘন্টা নৌকা ও ৫-৬ ঘন্টা হাটার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে এখানে পৌঁছাতে। মিথ্যা ধর্ম প্রচারের জন্য এদের কী একনিষ্ঠতা! অবাক লাগে ভাবতে। মাঝে মাঝে চলছে গান-বাজনা। সোলারের সাহায্যে চলা মাইকে শব্দও শোনা যাচ্ছে। কাপড়গুলো প্রায় সবই ভেজা থাকায় ঠাণ্ডায় ঘুম ভালো হ'ল না।

খুমের রাণী নাফাখুম

ভোরে ছালাত সেরে আগুন জ্বালিয়ে কাপড় শুকাতে লাগলাম। এদিকে বেলাল ভাই ৩ কেজি ওজনের একটি মোরগ রান্নায় চাপিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর খাওয়া-দাওয়া সেরে ৮-টার দিকে আমরা নাফাখুমের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। কিছুক্ষণ হাটতেই ত্রিপুরা উপজাতিদের অপর একটি পাড়া জিনাপাড়ায় চলে আসলাম। তারপর গ্রাম থেকে ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগলাম। নীচে নেমে রেমাক্রির কুল-কুল রবে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ

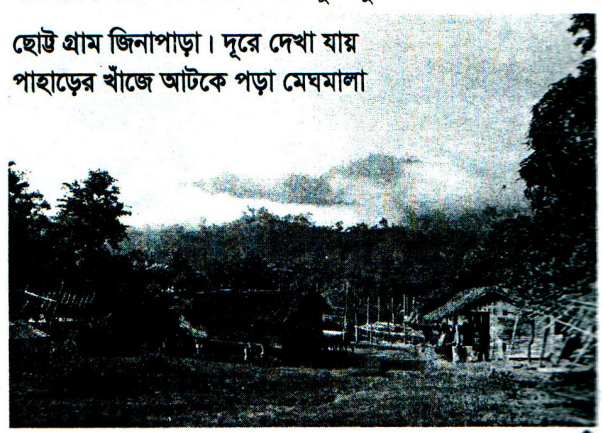
ছোট্ট গ্রাম জিনাপাড়া। দূরে দেখা যায় পাহাড়ের খাঁজে আটকে পড়া মেঘমালা

পানিতে পা ভেজালাম। বার কয়েক হাটু পানিতে খাল এপার-ওপার করে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ট্রেকিং-এর পর বেলা ১১-টায় আমরা পৌঁছলাম কাংখিত স্পট নাফাখুমে। থানচির সবচেয়ে নিকটবর্তী অথচ সুন্দরতম স্পট মনে হয় এটিই। প্রায় ২০ ফুট উঁচু থেকে রেমাক্রি খাল হঠাৎ নেমে যাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে এই মনমোহিনী জলপ্রপাতটি। পানি প্রবাহের ভলিউমের দিক থেকে সম্ভবতঃ নাফাখুম-ই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত। তবে আমিয়াখুম দেখার পর নাফাখুমের আবেদনটা ঠিক সেই মাত্রায় ধরা পড়ে না। সহযাত্রীদের কেউ কেউ সবুজ পানিতে গা-

ভিজিয়ে গোসল করল। আধা ঘন্টা পর আবার রওয়ানা হলাম। যেতে হবে রেমাক্রি জলপ্রপাতের উদ্দেশ্যে। আরো আড়াই ঘণ্টা পাথুরে পথে হাটার পর হেডম্যানপাড়া হয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের কাংখিত গন্তব্যে। সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় এ জলপ্রপাতটিও পিছিয়ে নেই। বিশাল এলাকা জুড়ে প্রায় ৪০ ফুট চওড়া কয়েকটি ধাপযুক্ত জলপ্রপাতটির মাধ্যমে রেমাক্রি খাল মূলতঃ ডানদিক থেকে বেরিয়ে আসা সাঙ্গু নদীর সাথে মিলেছে। জামা-কাপড় ছেড়ে দ্রুত নেমে গেলাম গোসল করতে। ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া ফেনিল ও গতিশীল পানির মধ্যে ডুব দিয়ে অসাধারণ আনন্দ পেলাম। তবে এসব সাহসের কাজে কাফী ভাই সবার আগে আগে। আর আমরা ভীতুর ডিমরা পানি দেখলেই নার্ভাস হয়ে যাই। তাওয়াব তো আমার চেয়ে আরো এক কাটা উপরে। যাক তিনজনে বেশ কিছুক্ষণ পানির সাথে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করে উঠে আসলাম। জামাকাপড় পরে রেডি হয়ে শুনি এ পাড়ার জঙ্গলে প্রচুর হরিণ থাকায় এখানে হরিণের গোশত পাওয়া যায়। অর্ডার দেয়া হ'ল এক বাটি। বেশ সুস্বাদু। আমাদের দীর্ঘ এক সপ্তাহের পদযুগল নির্ভর প্রকৃতিঘনিষ্ট সফর এ যাত্রায় এখানেই শেষ হ'ল।

বিদায়বেলা

শেষ পর্বে পাহাড়ের মধ্যদিয়ে বয়ে যাওয়া সাঙ্গু নদীতে এবার শুরু হবে নৌযাত্রা। বেলা পৌনে ২টায় একজনের বসার মত চওড়া ও ছয়জন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন সরু নৌকাটি স্টার্ট নিলো। ইঞ্জিন নৌকা আবার স্রোতের অনুকূলে হওয়ায় দ্রুতগতিতে চলতে লাগলো। মাঝে মাঝে পানির তলায় বড় বড় পাথরের মাথা দেখা যাচ্ছে। মাঝিরা দক্ষ হাতে সেগুলি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। একটু পর দেখি নদীর মাঝে চারিদিকে বড় বড় পাথর বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবুও যাত্রা বিরতি দেয়া হ'ল না। পাথরের ফাঁক দিয়ে ফাঁক গলিয়ে এধারে ওধারে বাড়ি খেয়েও নৌকাটি সাবলীলভাবে এগিয়ে চলল। একটু পরেই দেখা মিলল বিখ্যাত 'বড় পাথরে'র। বিরাটাকৃতির এই পাথরটিকে বহু পূর্ব থেকেই পাহাড়ীরা পূজা করে আসছে। এটা নিয়ে তাদের মধ্যে নানা মিথও চালু রয়েছে। এই পাথরটি পার হওয়ার পর নদীটি ঢালু হয়ে নেমে গেছে একেবারে থানচি পর্যন্ত। স্রোত অনেক বেশী তবে খুবই অগভীর। নৌকার তলা পাথরের আঘাতে প্রায়ই ফেটে যায়। আমাদের নৌকাও বার বার পাথরে ধাক্কা খেলেও কোন অসুবিধা হয়নি। মাঝিদের দক্ষতাও ছিল অসাধারণ। পথে পেরিয়ে এলাম অপার সৌন্দর্যের আরেক আঁধার মারমা ও মুরং উপজাতিদের বাসস্থান তিন্দু। এখানকার সৌন্দর্যের অনেক

নৌকা থেকে তিন্দু এলাকা

বিবরণ পড়েছি। তবে হাতে সময় কম থাকায় নামা হ'ল না। এক জায়গায় খুবই অগভীর হওয়ায় আমাদের তিনজনকে তীরে নামিয়ে দেওয়া হল পায়ে হাটার জন্য। কিছুদুর পায়ে হেটে আবার নৌকায় চেপে বসলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। স্থির সবুজ পানিরাশি আর দুপাশের জুম চাষ করা সবুজ পাহাড়। মনের মাঝে বিদায়ের সুর নাড়া দিচ্ছে। মোবাইল নেটওয়ার্ক পেয়ে বান্দরবান-ঢাকা বাসের টিকিট কাটার চেষ্টা করলাম। একসময় নৌকা ভিড়ে গেল থানচি বিডিআর ক্যাম্পের সিঁড়িতে। ভাড়া মিটিয়ে ক্যাম্পে রিপোর্ট করে চললাম বাজারে।

থানচি থেকে বান্দরবান যাওয়ার জন্য চাঁদের গাড়ি ভাড়া করার সিদ্ধান্ত হ'ল। বেলা আড়াইটার পর এ লাইনে লোকাল বাস সার্ভিস বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের ব্যাগ-পত্র গাইড অজিতের বাড়িতে রেখে গিয়েছিলাম। তার বাড়ীতে গেলাম। তার ফুটফুটে সন্তানটিকে আদর করে থানচি বাজারস্থ মসজিদে আসলাম ছালাত আদায় করতে। বাদ মাগরিব সাড়ে ৫-টায় চাঁদের গাড়িতে আমাদের ফিরতি যাত্রা শুরু হ'ল। সাড়ে ৭-টার দিকে একটি আর্মি চেকপোষ্টে আমাদের গাড়ী আটকে দেয়া হল। ৬-টার পর নাকি রাস্তায় গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। কিছুক্ষণ দেন-দরবার করার পর আমাদের ছাড়া হ'ল। অবশেষে রাত পৌনে ৯-টায় বান্দরবান বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছালাম। বান্দরবান-ঢাকার সব বাসের সীট একেবারে পিছনে। ব্যথাতুর শরীর নিয়ে সেগুলিতে উঠার সাহস করলাম না। ঘুরতে ঘুরতে সেন্টমার্টিন পরিবহনের একটি কোচে সামনের দিকে তিনটি সিট পেয়ে গেলাম। কিন্তু বাসটির চাকা তখন গড়তে শুরু করেছে। বাধ্য হয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে বাসে চেপে বসলাম। ভোর হ'তে হ'তেই ঢাকা। তারপর গাড়ি পরিবর্তন করে দুপুর নাগাদ পৌঁছে গেলাম রাজশাহী। *(সমাপ্ত)*

লেখক : কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

আলোকপাত

-তাওহীদের ডাক ডেস্ক

প্রশ্ন (০৪/০১) : মু'তাযিলা মতবাদ সম্পর্কে জানতে চাই?

-মুহাম্মাদ এনামুল হক্ব জয়
সাভার, ঢাকা।

উত্তর : ওয়াছিল বিন আতা (৮০-১৩১ হিঃ)-এর তত্ত্বাবধানে উক্ত মতবাদের সূচনা হয়। 'ই'তিযাল' বা বিচ্ছিন্ন হওয়া শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। এই মতবাদের অনুসারীরা আল্লাহ তা'আলাকে গুণহীন সত্তা মনে করে। আল্লাহ ইলম (জ্ঞান) ছাড়াই আলীম (সর্বজ্ঞ)। কুদরত (শক্তি) ছাড়াই ক্বাদীর (সর্বশক্তিমান)। হায়াত (জীবন) ছাড়াই হাই (চিরঞ্জীব) ইত্যাদি। এরা ছাহাবায়ে কেরামের রাস্তা ছেড়ে নতুন দর্শনের জন্ম দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে *(মুহাম্মাদ বিন আব্দুল করীম শহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/৪২ পৃঃ)*। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ওয়াছিল বিন আতা হাসান বাছরী (রহঃ)-এর শিষ্য ছিলেন। ঈমানের মূলনীতি সম্পর্কে তিনি হাসান বছরীর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে তার সঙ্গ ত্যাগ করেন। তখন উস্তাদ হিসাবে বলেছিলেন, 'ওয়াছিল আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল'। এ থেকেই তাদেরকে 'মু'তাযিলা' বলা হয় *(আল-মিলাল ওয়ান নিহাল ১/৪২ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত মতবাদগুলো অসংখ্য দলে উপদলে বিভক্ত হয়েছে। সে সময়ে এ ধরনের আরো অনেক দল গজিয়ে উঠেছিল। যেমন জাহমিয়া, জাবরিয়া, মু'আত্তিলা, মাতরুদিয়া, ইসমাঈলিয়া ইত্যাদি।

প্রশ্ন (০৪/০৩) : 'দ্বীনে ইলাহী' নামক ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাই?

-আশরাফুল ইসলাম, যশোর

উত্তর : 'দ্বীনে ইলাহী' বা দ্বীনে ইলাহী আকবর শাহী' তৃতীয় মোঘল সম্রাট আবুল ফাতাহ জালালুদ্দীন মুহাম্মাদ আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত একটি ধর্ম। সম্রাট আকবর ছিলেন সম্রাট হুমায়ুনের পুত্র। পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৩ বছর বয়সী আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর তিনি তার সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও উন্নতিকল্পে যে সমস্ত নীতি গ্রহণ করেন তার মধ্যে অন্যতম হল সর্বধর্ম সমন্বয়ের নীতি। যাতে বহুজাতিক দেশ ভারতবর্ষের সব ধর্মের অনুসারীগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং তার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট প্রকাশ ও বিদ্রোহের মনোভাব সৃষ্টি না হয়। ফলে তিনি ইসলাম ধর্মের অনেক বিধি-বিধানকে বাদ দিয়ে এবং অন্যান্য ধর্মের কতিপয় নীতিমালার সমন্বয়ে গত ৯৮৯ হিজরী মোতাবেক ১৫৮১ সালে দ্বীনে ইলাহী প্রবর্তন করেন। এটি একটি ভ্রান্ত ধর্মমত ও মনগড়া মতবাদ।

'দ্বীনী ইলাহী' ধর্মের আক্বীদা :

(১) এ ধর্মের কালেমা ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবারু খলীফাতুল্লাহ। (২) পরস্পর সাক্ষাতে সালামের পরিবর্তে আল্লাহু আকবার জাল্লা জালালুহু চালু করেন। (৩) এই ধর্মে আগুনকে পবিত্র মনে করা হত। (৪) সম্রাট আকবর সূর্যকে দেবতা জ্ঞান করতেন। (৫) তিনি নিজেকে সেজদা করার নিয়ম চালু করেন। (৬) তিনি পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন। (৭) আকবরমহলে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ ছিল। (৮) ছায়েমদেরকে জোরপূর্বক পানাহার করাত। (৯) মুসলিমদের নিকট থেকে যাকাত নেওয়া বন্ধ করা হয়েছিল। (১০) হজ্জের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত করা হয়। (১১) আকবরী ধর্মে নারীদের পর্দা করা নিষেধ। (১২) ১২ বছর বয়সের পূর্বে খাৎনা করা নিষেধ। (১৩) দাড়ি রাখা নিষেধ (১৪) একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ (১৫) বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ। (১৬) মদ, জুয়া ও সূদ বৈধ। (১৭) শুকর ও কুকুর হারাম হওয়ার আয়াত রহিত করা হয়েছিল। (১৮) রেশমী কাপড় পুরুষদের জন্য বৈধ। (১৯) কবরে মৃতব্যক্তির মাথা পূর্ব দিকে এবং পা পশ্চিম দিকে রাখা প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, দ্বীনে ইলাহীতে হিন্দু ধর্মের রাজনীতিকে সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল।

এভাবে সম্রাট আকবর সকল ধর্মের সমন্বয়ে 'দ্বীনে ইলাহী' ধর্ম প্রবর্তন করেন। তবে হিন্দু রাজা বীরবল সহ সর্বমোট ১৮ জন মানুষ এই ধর্ম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন (০৪/০৪) : কওমে লূতের ধ্বংসের বিবরণ বিস্তারিত জানতে চাই?

-সাইফুল ইসলাম, চট্টগ্রাম

উত্তর : আল্লাহ্র হুকুমে কয়েকজন ফেরেশতা মানুষের রূপ ধারণ করে প্রথমে ইবরাহীম (আঃ)-এর বাড়ীতে পদার্পণ করেন। তিনি তাদেরকে মেহমানদারীর জন্য একটা আস্ত বাছুর গরু যবহের পর ভুনা করে তাদের সামনে পরিবেশন করেন। কিন্তু তারা তাতে হাত দিলেন না। এতে ইবরাহীম (আঃ) ভয় পেয়ে যান *(হূদ ১১/৬৯-৭০)*। কেননা এটা ঐ সময়কার দস্যু-ডাকাতদেরই স্বভাব ছিল যে, তারা যে বাড়ীতে ডাকাতি করত বা যাকে খুন করতে চাইত, তার বাড়ীতে খেত না। ফেরেশতাগণ নবীকে অভয় দিলেন এবং নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমরা এসেছি অমুক শহরগুলো ধ্বংস করে দিতে'। ইবরাহীম (আঃ) একথা শুনে তাদের সাথে তর্ক জুড়ে দিলেন *(হূদ ১১/৭৪)* এবং বললেন, সেখানে যে লূত আছে। তারা বললেন, সেখানে কারা আছে, আমরা তা ভালভাবেই জানি। আমরা অবশ্যই তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করব, তবে তাঁর স্ত্রী ব্যতীত। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আনকাবূত ২৯/৩১-৩২)*। অতঃপর তারা ইবরাহীম দম্পতিকে ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ শুনালেন। অতঃপর কেন'আনে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট থেকে বিদায় হয়ে ফেরেশতাগণ সাদূম নগরীতে লূত (আঃ)-এর গৃহে উপস্থিত হলেন *(হিজর ১৫/৬১)*। এ সময় তাঁরা অনিন্দ্য সুন্দর নওজোয়ান রূপে আবির্ভূত হন। কেননা আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করেন, তখন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের পরীক্ষা নেন। সাদূম জাতি তাদের এই চূড়ান্ত পরীক্ষায় ব্যর্থকাম হল। তারা যখন জানতে পারল যে, লূত-এর বাড়ীতে অতীব সুদর্শন কয়েকজন নওজোয়ান এসেছে, তখন তারা খুশীতে আত্মহারা হয়ে সেদিকে ছুটে এল *(হূদ ১১/৭৮)*। এ দৃশ্য দেখে লূত (আঃ) তাদেরকে অনুরোধ করে বললেন, فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অতিথিদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে লজ্জিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি একজনও ভাল মানুষ নেই'? *(হূদ ১১/৭৮)*। কিন্তু তারা কোন

কথাই শুনলো না। তারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকার উপক্রম করল। লূত (আঃ) বললেন, হায়! وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ 'আজকে আমার জন্য বড়ই সংকটময় দিন' *(হূদ ১১/৭৭)*। অতঃপর তিনি বললেন, لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ 'হায়! যদি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন শক্তি থাকত, অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় পেতাম' *(হূদ ১১/৮০)*। এবার ফেরেশতগণ আত্মপরিচয় দিলেন এবং লূতকে অভয় দিয়ে বললেন, يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ 'হে লূত! আমরা আপনার প্রভুর প্রেরিত ফেরেশতা। ওরা কখনোই আমাদের নিকটে পৌঁছতে পারবে না' *(হূদ ১১/৮১)*।

অতঃপর জিবরীল তাদের দিকে পাখার ঝাপটা মারতেই বীর পুঙ্গরেরা সব অন্ধ হয়ে ভেগে গেল। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ 'ওরা লূতের কাছে তাঁর মেহমানদের দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত করে দিলাম। অতএব আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও হুঁশিয়ারী' *(ক্বামার ৫৪/৩৭)*।

অতঃপর ফেরেশতগণ লূত (আঃ)-কে স্বীয় পরিবারবর্গসহ *(ক্বামার ৫৪/৩৪)* কিছু রাত থাকতেই এলাকা ত্যাগ করতে বললেন এবং বলে দিলেন যেন কেউ পিছন ফিরে না দেখে। তবে আপনার বৃদ্ধা স্ত্রী ব্যতীত। নিশ্চয় তার উপর ঐ গযব আপতিত হবে, যা ওদের উপরে হবে। ভোর পর্যন্তই ওদের মেয়াদ। ভোর কি খুব নিকটে নয়? *(হূদ ১১/৮১)*। লূত (আঃ)-এর স্ত্রী ঈমান আনেননি এবং হয়তবা স্বামীর সঙ্গে রওয়ানাই হননি। তারা আরো বললেন, وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ 'আপনি তাদের পিছে অনুসরণ করুন। আর কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায় আপনারা আপনাদের নির্দেশিত স্থানে চলে যান *(হিজর ১৫/৬৫)*।

অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে অতি প্রত্যুষে গযব কার্যকর হয়। লূত (আঃ) ও তাঁর সাথীগণ যখন নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছেন, তখন জিবরীল (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ পাওয়া মাত্রই ছুবহে ছাদিকের সময় একটি প্রচণ্ড নিনাদের মাধ্যমে তাদের শহরগুলোকে উপরে উটিয়ে উপুড় করে ফেলে দিলেন এবং সাথে সাথে প্রবল বেগে ঘূর্ণিবায়ুর সাথে প্রস্তর বর্ষণ শুরু হয় *(হূদ ১১/৮২-৮৩)*।

সুধী পাঠক! এটা ছিল তাদের কুকর্মের সাথে সামঞ্জস্যশীল শাস্তি। কেননা তারা যেমন আল্লাহ্র আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উল্টিয়েছিল অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গ বাদ দিয়ে মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে পুংমৈথুনে ও সমকামিতায় লিপ্ত হয়েছিল, ঠিক তেমনি তাদেরকে মাটি উল্টিয়ে উপুড় করে শাস্তি দেওয়া হল *(দ্র. নবীদের কাহিনী ১/১৫৬-১৫৯)*।

প্রশ্ন (০৪/০৫) : মু'জেযা ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য কি?

-আল-মামুন, মানিকদিয়া, মেহেরপুর।

উত্তর : মু'জেযা অর্থ মানুষের বুদ্ধিকে অক্ষমকারী। অর্থাৎ এমন কর্ম সংঘটিত হওয়া যা মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা বহির্ভূত। (১) 'মু'জেযা' কেবল নবীগণের জন্য খাছ এবং 'কারামাত' আল্লাহ তাঁর নেক্কার বান্দাদের মাধ্যমে কখনো কখনো প্রকাশ করে থাকেন। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। (২) মু'জেযা নবীগণের মাধ্যমে সরাসরি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়। পক্ষান্তরে জাদু কেবল দুষ্ট জিন ও মানুষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং তা হয় অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে। (৩) জাদু কেবল পৃথিবীতেই ক্রিয়াশীল হয়, আসমানে নয়। কিন্তু মু'জেযা আল্লাহ্র হুকুমে আসমান ও যমীনে সর্বত্র ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন শেষ নবী (ছাঃ)-এর অঙ্গুলী সংকেতে আকাশের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। (৪) মু'জেযা মানুষের কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু জাদু স্রেফ ভেল্কিবাজি ও প্রতারণা মাত্র এবং যা মানুষের কেবল ক্ষতিই করে থাকে *(দ্র. নবীদের কাহিনী ২/৩৮-৩৯)*।

প্রশ্ন (০৪/০৬) : খিযির কে? দলীল সহ জানতে চাই।

-ওমর আলী, রাজনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কুরআনে তাঁকে عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا 'আমাদের বান্দাদের একজন' *(কাহাফ ১৮/৬৫)* বলা হয়েছে। বুখারীতে তাঁর নাম খিযির (خضر) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে নবী বলা হয়নি। সমাজে প্রচলিত আছে যে, তিনি একজন অলী ছিলেন এবং মৃত্যু হয়ে গেলেও এখনও মানুষের বেশ ধরে যেকোন সময় যেকোন মানুষের উপকার করেন। ফলে জঙ্গলে ও সাগর বক্ষে বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য আজও অনেকে খিযিরের অসীলা পাবার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে মানত করে থাকে। এসব ধারণার প্রসার ঘটেছে মূলতঃ বড় বড় প্রাচীন মনীষীদের নামে বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে উল্লেখিত কিছু কিছু ভিত্তিহীন কল্পকথার উপরে ভিত্তি করে।

যারা তাঁকে নবী বলেন, তাদের দাবীর ভিত্তি হল, খিযিরের বক্তব্য وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي 'আমি এসব নিজের মতে করিনি' *(কাহাফ ১৮/৮২)*। অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহ্র নির্দেশে করেছি। অলীগণের কাশ্ফ-ইলহাম শরী'আতের দলীল নয়। কিন্তু নবীগণের স্বপ্নও আল্লাহ্র অহী হয়ে থাকে। যেজন্য ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। অতএব বালক হত্যার মত ঘটনা কেবলমাত্র নবীর পক্ষেই সম্ভব, কোন অলীর পক্ষে আদৌ নয়। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নবী কখনো শরী'আত বিরোধী কাজ করতে পারেন না। ঐ সময় শরী'আতধারী নবী ও রাসূল ছিলেন মূসা (আঃ)। আর সে কারণেই খিযিরের শরী'আত বিরোধী কাজ দেখে তিনি বারবার প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিলেন। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, খিযির কোন কেতাবধারী রাসূল ছিলেন না বা তাঁর কোন উম্মত ছিল না।

এক্ষণে আমরা যদি বিষয়টিকে কুরআনের প্রকাশ্য অর্থের উপরে ছেড়ে দিই এবং তাঁকে 'আল্লাহ্র একজন বান্দা' হিসাবে গণ্য করি, যাঁকে আল্লাহ্র ভাষায় آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا 'আমরা আমাদের পক্ষ হতে বিশেষ রহমত দান করেছিলোম এবং আমাদের পক্ষ হতে দিয়েছিলোম এক বিশেষ জ্ঞান' *(কাহাফ ১৮/৬৫)*। তাহলে তিনি নবী ছিলেন কি অলী ছিলেন, তিনি এখনো বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন, এসব বিতর্কের আর কোন অবকাশ থাকে না।

মনে রাখা আবশ্যক যে, লোকমান অত্যন্ত উঁচুদরের একজন জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তাঁর জ্ঞানপূর্ণ উপদেশসমূহ কুরআনে বর্নিত হয়েছে এবং তাঁর নামে একটি সূরা নাযিল হয়েছে। কিন্তু তিনি নবী ছিলেন না। লোকমানকে আল্লাহ যেমন বিশেষ 'হিকমত' দান করেছিলেন *(লোকমান ৩১/১২)*। খিযিরকেও তেমনি বিশেষ

'ইলম' দান করেছিলেন *(কাহাফ ১৮/৬৫)*। এটা বিচিত্র কিছু নয় *(দ্র. নবীদের কাহিনী ২/১০৭-১০৮)*।

প্রশ্ন (০৪/০৭) : ইন্টারপোল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই?

- শফিকুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ইন্টারপোল একটি আন্তঃরাষ্ট্রিয় পারস্পরিক সহযোগিতা মূলক আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা। এটি ১৯২৩ সালের ৭ নভেম্বর থেকে যাত্রা শুরু করে। সূচনাতে এর নাম ছিল The International Criminal Police Commission (ICPC). পরবর্তীতে The International Criminal Police Organization or INTERPOL নামে নামকরণ করা হয়। এর বার্ষিক বাজেট প্রায় ৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ১৯০টি সদস্যভুক্ত দেশের মধ্যে বার্ষিক অবদানের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। বর্তমানে এর সদর দফতর ফ্রান্সের লিউনে। এটি জাতিসংঘের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংস্থা।

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্যভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে অপরাধ অনুসন্ধানের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। ১৯২৩ সালে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর ১৯৪৬ সালে এর কাজ পুনরায় শুরু হয়। ইন্টারপোলের একটা সাধারণ পরিষদ রয়েছে। এর অধিবেশন এক-এক সময় এক-এক সদস্যরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যরাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ত্বরিত যোগাযোগ স্থাপন, অপরাধীদের সন্ধান, গতিরোধ ও গ্রেফতার ইত্যাদির জন্য এই কমিশনের বেতার-যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। আর এ ব্যবস্থাসমূহ সবই আধুনিক উন্নতমানের প্রযুক্তি সম্পন্ন। পরিশেষে ২০১৩ সালে ইন্টাপোলের সাধারণ সচিবলায়ে ১০০ দেশের মোট ৭৫৬ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য।

জার্মানী ফেডারেল ক্রিমিনাল পুলিশ অফিসের সাবেক ডেপুটি প্রধান জনাব জারজেন স্টক বর্তমানে এর মহাসচিব। বর্তমান প্রেসিডেন্ট, ফরাসি বিচার বিভাগীয় পুলিশের প্রধান গরৎবরষষব ইধষষবংঃৎধুর. যিনি সাবেক ডেপুটি কেন্দ্রীয় পরিচালক ছিলেন।

ইন্টারপোল সর্বদা রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ থাকে। তার চার্টার হল একটি রাজনৈতিক, সামরিক, ধর্মীয়, জাতিগত প্রভৃতির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ বা কার্যক্রম গ্রহণ করা থেকে সর্বদা বিরত থাকা। বরং অপরাধ জগতকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করাই তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য। যেমন এটি জননিরাপত্তা স্থিতিশীলতা প্রতিস্থাপনে জোরালো ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি সন্ত্রাস, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, পরিবেশগত অপরাধ, গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, জলদস্যুতা, শিল্প, অবৈধ মাদক উৎপাদন, মাদক পাচার, অস্ত্র চোরাচালান, মানব পাচার, অর্থ পাচার, শিশু পর্ণোগ্রাফি, সাইবার অপরাধ, মেধা সম্পত্তি অপরাধ এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন (০৪/০৮) : ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে যাওয়ার কারণ কি ছিল?

নাসিম, নাটোর

উত্তর : আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনদিন পর গযব অবতীর্ণ হবে বলে ইউনুস (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে এলাকা ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর গোত্র তওবা করায় তারা ধ্বংস হয়নি। এটা জানতে পারার পরও আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা না করে তিনি হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। যাতে করে তার গোত্র তাকে মিথ্যাবাদী বলে হত্যা করতে না পারে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে 'মনিবের নিকট থেকে পলায়নকারী' *(কুলম ৬৮/৪৮-৫০)* বলেছেন। যদিও বাহ্যত এটা কোন অপরাধ ছিল না। কিন্তু পয়গম্বর ও নৈকট্যশীল ব্যক্তিদের মর্তবা অনেক উর্ধ্বে। তাই আল্লাহ তাদের ছোট-খাট ত্রুটির জন্যও পাকড়াও করেন। ফলে তিনি আল্লাহ্র পরীক্ষায় পতিত হন *(নবীদের কাহিনী ২/১১২-১১৪)*।

ইউনুস (আঃ)-এর মাছের পেটে যাওয়ার ব্যাপারে আধুনিক মুফাসসির বলেন, রিসালাতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি ঘটায় এবং সময়ের পূর্বেই এলাকা ত্যাগ করায় তাকে এই পরীক্ষায় পড়তে হয়েছিল। আর নবী চলে যাওয়ার কারণেই তার সম্প্রদায়কে আযাব দানে আল্লাহ সম্মত হননি। অথচ পুরো দৃষ্টিকোণটাই ভুল। কেননা কোন নবী থেকেই তাঁর নবুঅতের দায়িত্ব পালনে ত্রুটির কল্পনা করা নবীগণের নিষ্পাপত্বের আক্বীদার ঘোর বিপরীত। বরং তিনদিন পর আযাব আসবে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এরূপ নির্দেশনা পেয়ে তাঁর হুকুমেই তিনি এলাকা ত্যাগ করেছিলেন। আর তাঁর কওম থেকে গযব উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাদের আন্তরিক তওবার কারণে, নবী চলে যাওয়ার কারণে নয় *(নবীদের কাহিনী ২/১১৪)*।

প্রশ্ন (০৫/১১) : ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে আল্লাহ্র অঙ্গীকারগুলো কি কি?

ওবাইদুল হক্ব, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

উত্তর : ইহূদীদের বিপক্ষে ঈসা (আঃ)-কে সাহায্যের ব্যাপারে আল্লাহ পাঁচটি ওয়াদা করেছিলেন এবং সবক'টি তিনি পূর্ণ করেন। যথা- (১) হত্যার মাধ্যমে নয়, বরং তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে (২) তাঁকে উর্ধ্বজগতে তুলে নেওয়া হবে (৩) তাঁকে শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করা হবে (৪) অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে ঈসার অনুসারীদেরকে ক্বিয়ামত অবধি বিজয়ী রাখা হবে এবং (৫) ক্বিয়ামতের দিন সবকিছুর চূড়ান্ত ফায়ছালা করা হবে *(আলে ইমরান ৩/৫৫)*।

প্রশ্ন (০৫/১২) : অমুসলিম ও ফাসেক মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে মুমিনের কর্তব্য কি কি?

-যিয়াউর রহমান, কুষ্টিয়া

উত্তর : অমুসলিম ও ফাসেক মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে মুমিনের কর্তব্য ৫টি। যথা- (১) উত্তমপন্থায় অন্যায়ের প্রতিবাদ করা (২) দেশে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য জনমত গঠন করা এবং বৈধপন্থায় সর্বাত্মক প্রচষ্টা চালানো (৩) বিভিন্ন উপায়ে সরকারকে নছীহত করা (৪) সরকারের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা এবং (৫) সরকারের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নিকটে কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করা *(দ্র. জিহাদ ও ক্বিতাল, পৃঃ ৬১)*।

প্রশ্ন (৪/১৩) : আহলেহাদীছ-এর নিকটে দেশের আইন রচনার মূলনীতিসমূহ কি কি?

-নূরে আলম, নোয়াখালী

উত্তর : (১) আল্লাহকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস হিসাবে মেনে নেওয়া (২) আল্লাহ্র বিধানকে অভ্রান্ত সত্যের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা (৩) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে আইন রচনার মূল ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা (৪) অস্পষ্ট বিষয়গুলোতে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও ইজমায়ে ছাহাবার আলোকে ইজতিহাদ করা এবং (৫) মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণের উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধান করা *(আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, পৃঃ ৫৫)*।

কবিতা

সফল যেন হয়

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব
নওদাপাড়া মাদরাসা

‘তাবলীগী ইজতেমা’ এসেছে আবার
তাই নেই সময় আর বসে থাকার
ছুটে চল সবে ইজতেমা প্রাঙ্গনে
কুরআন আর সুন্নাহর জ্ঞান আহরণে
বিদ‘আত যেথায় চির পদদলিত
সুন্নাহ সেথায় অমর প্রতিষ্ঠিত
দেখায় মোদের ছিরাতে মুস্তাক্বীম
যে পথে চলেছে রাসূলে কারীম।।
তাবলীগ হল প্রচার ও প্রসার
ইজতেমা হল জমায়েত শ্রোতার
নেই উদ্দেশ্য কোন জাগতিক
চাই যা মোরা সবই পারলৌকিক।
‘তাবলীগী ইজতেমা’ সেথায় মোদের
নেই কোন অনুসরণ ছেড়ে রাসূলের
নিবদ্ধ লক্ষ মোদের ঐ জান্নাত
প্রচেষ্টা চালায় তাই দিনরাত।
সংগ্রাম ভিন্ন নয় মুমিন জীবন
করতে হবে জিহাদ সর্বত্র আমরণ।
প্রেরনা মোদের হামযাহ আর খালিদ
দিতে পারি তপ্ত লহু হতে যে শহীদ
আলস্য ছেড়ে চল এখনি যাই
পেতে অভ্রান্ত বাণী কোন সংশয় নাই
দোয়া করি তোমার নিকট হে দয়াময়
‘তাবলীগী ইজতেমা’ সফল যেন হয়।।

--o--

আযানের ধ্বনি

-শফিকুল ইসলাম (শফিক)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আযানের ধ্বনি সুমধুর ধ্বনি শোনো ভাই কান পেতে,
বাতাসের মাঝে ভাসে সেই ধ্বনি মসজিদ মিনারেতে।
ঘুম থেকে ওঠো আর ঘুম নয়,
বিছানার ঘুম বিছানায় রয়,
ওযু করে নাও ছালাতের তাড়া এখুনি সময় যেতে
আযানের ধ্বনি সুমধুর ধ্বনি শোনো ভাই কান পেতে,
আযানের ধ্বনি শুনতে চাইলে জানালাটা রাখো খুলে,
সময়ের ঘড়ি বাজে টিক টিক চেয়ে দেখো আঁখি তুলে।
মুয়ায্যিনতো ডাকে মধু স্বরে,
কারো কারো চোখ তবু ঘুমে ভরে,
ঘুমে কেন বলো হবে দিশেহারা ইবাদত করো জাগি;
আলসেমী সব ধুয়ে মুছে যাক্ ওরে প্রিয় অনুরাগী।
আযানের প্রতি যার মন-প্রাণ হয়ে যায় একাকার,
তার কাছে ঘুম ছালাতের টানে হয়ে যায় ছারখার।
মসজিদে চলো মুসলিম ভাই,
কাঁধে কাঁধে মিলে ছালাতে দাঁড়াই,
হিংসা-বিদ্বেষ এসো দূর করি মোরা মুসলিম জাতি,
সারা পৃথিবীর সব ভাই মোরা আযানের সুরে মাতি।

--o--

বাংলার যমীন

-আব্দুর রাকীব
মঠবাড়ী, তালা, সাতক্ষীরা

বাংলার যমীন, অসহায় মুমিন
রাখলে দাড়ি পেতে হয় জঙ্গী নামের অপবাধ খানি।
বাংলার যমীন, সরকার ইসলামের প্রতি উদাসীন
রচনা করছে ইসলাম ছাড়া মনগড়া আইন।
বাংলার যমীন, ইসলামের নামে
হাযারো দলে বিভক্ত মুসলিম।
বাংলার যমীন, নামধারী মুসলিম
স্বার্থের তরে বরবাদ করছে নবীর দ্বীন।
বাংলার যমীন, অপসংস্কৃতি রঙ্গিন
অশ্লীলতায় মত্ত যুবসমাজ প্রতিদিন
বাংলার যমীন, অবহেলিত ঈদের দিন
গুরুত্ব যেন এদের কাছে ঈদে মীলাদুন্নবীর দিন।
বাংলার যমীন, দলে দলে যোগ দিন
‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে’
কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে চলার পথে
পাথেয় করে নিন।

--o--

মার্জনা

-মুহাম্মদ মীযানুর রহমান মণ্ডল
জয়পুরহাট।

আমি আমন্ত্রিত অতিথি হে প্রভু-
আমাকে অপদস্ত কর না
অনেক ভুলের মাঝে আমি একাকার।
আমি আমন্ত্রিত মুসাফির হে প্রভু-
আমাকে ভর্ৎসনা কর না
আমি তোমার সতর্কবাণী শুনেছি,
জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনের কথা শুনেছি,
‘আদ-ছামূদ জাতির ভয়াবহতার কথা শুনেছি
কর্ণপাত করি নাই।
অনেক ভুলের মাঝে আমি একাকার
আমাকে মার্জনা কর প্রভু।
নির্লজ্জের মত আমি থেমে গেছি
হেরে গেছি প্রযুক্তির কাছে,
হৃদয়তার কাছে আমি প্রশ্নহীন এক মানব
আশ্চর্য রকমে আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে অন্ধকার,
আমি দিশেহারা হয়েছি রঙ্গ-তামাশায়।
আমাকে ক্ষমা কর প্রভু
আমাকে মার্জনা কর্।
আমি অতীতের গর্ভ থেকে পলায়ন করেছি
অনাদিকাল থেকে আমি বর্তমানের কাছে হেরে গেছি,
আমি ভেবে দেখি নাই-
আমি অপদার্থ কাপুরুষ।
আমি সম্ভ্রান্ত এক অভিনেতা হে প্রভু-
আমাকে অপদস্ত কর না।
অনেক ভুলের মাঝে আমি সমাধিতে
আমাকে মার্জনা কর প্রভু।

--o--

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্রীয় সংবাদ

দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মপরিষদ সদস্য প্রশিক্ষণ ২০১৫

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২ ও ১৩ মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য ১২ মার্চ বৃহস্পতিবার বাদ ফজর হতে ১৩ মার্চ শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দু'দিন ব্যাপী **'যেলা কর্মপরিষদ সদস্য প্রশিক্ষণ ২০১৫'** গ্রুপ 'ক' অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। উক্ত প্রশিক্ষণে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুল রহমান, সাধারণ সম্পাদক আরীফুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকীব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় দিন শুক্রবার জুম'আর পূর্বে 'যুবসংঘ'-এর সদ্য সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন যোগদান করেন। তিনি গত ৭ নভেম্বর রোজ শুক্রবার ঢাকার মুহাম্মাদপুরস্থ আল-আমীন জামে মসজিদ থেকে 'চ্যানেল আই'-এর উপস্থাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারূকী হত্যা মামলায় সন্দেহভাজনভাবে গ্রেফতার হন। অতঃপর দীর্ঘ ৪ মাস ২ দিন কারাভোগের পর গত ৮ মার্চ তিনি যামিনে মুক্তি লাভ করেন। ফালিল্লাহিল হামদ। তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে জেলখানার স্মৃতিচারণ করেন এবং সকলকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর এই হক্বের দাওয়াতকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তর

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৩ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় ও ৩য় তলা থেকে পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ২য় তলায় স্থানান্তর করা হয়েছে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার উক্ত অফিস দু'টির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মজলিশে আমেলার সদস্যবৃন্দ, 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং মাসিক বৈঠক উপলক্ষ্যে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ও প্রতিনিধিবৃন্দ।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

যেলা সংবাদ : জয়পুরহাট

উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন

গভরপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট, ৩ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আয় গভরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' আক্কেলপুর উপযেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুন নূরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাজমুল হক্ব। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর উপদেষ্টা আব্দুর রহীম মাস্টার। পরিশেষে মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট আক্কেলপুর যুবসংঘ উপযেলা কমিটি পূর্নগঠন করা হয়।

শাখা কমিটি পুনর্গঠন

মুনঝার বাজার, ক্ষেতলাল, জয়পুহাট, ১৬ জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ মুনঝার বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' মুনঝার শাখা গঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ক্ষেতলাল উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ শাহাদৎ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাজমুল হক্ব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক আল-আমীন। পরিশেষে আব্দুল কাদিরকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ কামালুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট মুনঝার কমিটি গঠন করা হয়।

আমাইল, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ আমাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' আমাইল শাখা কমিটি পুনর্গঠন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাঁচবিবি উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাজমুল হক্ব। পরিশেষে মুয়াজ্জেম হোসেনকে সভাপতি এবং আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট আমাইল শাখা কমিটি পুনর্গঠিত করা হয়।

জুম্মাপাড়া, কালাই, জয়পুরহাট, ২০ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ জুম্মাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' কালাই শাখা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কালাই উপযেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবুল

কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ সারোয়ার, যেলা 'সোনামণি'-এর পরিচালক মুনায়েম হোসেন। পরিশেষে আবু মূসাকে সভাপতি এবং আব্দুল কাফীকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কালাই বাজার শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

ধুনট, কালাই, জয়পুরহাট ১৫ ফেব্রুয়ারী রবিবার : অদ্য বাদ আছর থুপসারা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' ধুনট শাখা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কালাই উপযেলা 'যুবসংঘে'র সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ। পরিশেষে সোহরাব হোসেনকে সভাপতি এবং আব্দুস সালামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ধুনট শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

গভরপুর, জামালগঞ্জ, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট ২১ ফেব্রুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ যোহর গভরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' গভরপুর শাখা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আব্দুর রহীম মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সহ-সভাপতি আব্দুন নূর। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাক আহমাদ সরোয়ার ও অর্থ সম্পাদক আব্দুর রহমান। পরিশেষে আবু জাফরকে সভাপতি এবং মুহাম্মাদ কাওছারকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট গভরপুর শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

বাখরা উত্তরপাড়া, কালাই, জয়পুরহাট ২৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ বাখরা উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'যুবসংঘ' বাখরা শাখা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আব্দুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবুল কালাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক্ব ও অত্র মসজিদের ইমাম গোলাম মুছত্বফা। পরিশেষে আব্দুস সালামকে সভাপতি এবং নাছির হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট বাখরা উত্তরপাড়া শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

মুযাফফর বিন মুহসিনের যামিনে মুক্তিলাভ

দীর্ঘ ৪ মাস ২দিন মিথ্যা মামলায় কারা নির্যাতন ভোগের পর গত ৮ই মার্চ বরিবার হাইকোর্ট থেকে যামিন পেয়ে পরদিন ৯ই মার্চ সোমবার গাযীপুরের কাশিমপুর-১ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মুযাফফর বিন মুহসিন। জেল গেইটে তাকে অভ্যর্থনা জানান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঢাকা যেলার অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ ইবরাহীম (ঢাকা) ও জনাব রিয়াযুল ইসলাম (ঢাকা) প্রমুখ। জেল গেইট থেকে বের হয়ে তিনি সাথীদের সাথে কুশল বিনিময়ের পর জনাব ইবরাহীম ছাহেবের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ঢাকার ভাসানটেকে তার বাসায় গমন করেন। সেখানে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব আলমগীর হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হুমায়ুন কবীর সহ অনেকে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এদিকে তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মেহেরপুর থেকে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার নাইটকোচ যোগে ঢাকা রওনা হন। পরদিন সকালে তিনি ভাসানটেকে পৌঁছে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়া নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মাহফূযুল ইসলাম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ শরীফুদ্দীন ভূঁইয়া সহ আরও অনেকে সেখানে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর সেখান থেকে মাইক্রো যোগে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ তাকে নিয়ে সকাল ১০-টায় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

পথিমধ্যে সিরাজগঞ্জের কড্ডার মোড়ে স্থানীয় মিন্টু চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে তার বাসায় কিছু সময় যাত্রা বিরতির পর বিকাল ৫-টায় তারা রাজশাহী মারকাযে পৌঁছেন। রাজশাহী পৌঁছলে মারকাযের শিক্ষক-ছাত্রসহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ তাকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি প্রথমে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর পশ্চিম পার্শ্বের মসজিদে অপেক্ষমাণ শিক্ষক, ছাত্র এবং রাজশাহী যেলা ও মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মী ও দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেখানে গমন করেন। সেখানে সমবেত সুধীদের উদ্দেশ্যে তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করেন। এ সময়ে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, বিপদে মুমিনের ঈমানের পরীক্ষা হয়। এ পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করলে এবং আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট থাকলে অশেষ নেকী লাভ হয়। অতএব তার এই কারাবরণ যেন পরকালীন মুক্তির অসীলা হয়, তিনি সেই দো'আ করেন।

'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী ও মারকাযের শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও মারকাযের শিক্ষক নূরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, গত ৭ই নভেম্বর শুক্রবার বাদ জুম'আ ঢাকার মুহাম্মাদপুর আল-আমীন জামে মসজিদে খুৎবা দিয়ে ছালাত শেষে বের হবার পর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের দু'জন কর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে মুযাফফর বিন মুহসিনকে নিয়ে যায়। অতঃপর ২দিন ডিবি কার্যালয়ে আটকে রাখার পর অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তদের হাতে নিহত 'চ্যানেল আই'-এর উপস্থাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ফারুকী হত্যা মামলায় সন্দেহ ভাজন আসামী হিসাবে গ্রেফতার দেখায়।

আইকিউ

[কুইজ-১; কুইজ-২; বর্ণের খেলা-৩ ও সংখ্যা প্রতিযোগ-৪-এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ২৫ এপ্রিলের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ ১/৮ (১) :

১. বেলায়েত আলী কবে বাংলাদেশে আগমন করেন?

২. বাংলাদেশে মোট পত্রিকার সংখ্যার কতটি?

৩. একটি শিশুর ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়’ কোন্‌টি?

৪. নূহ (আঃ)-এর যুগে যে পাঁচজনকে পূঁজা করা হত তাদের নাম কি কি?

৫. বান্দার ভিতরে শয়তানের প্রবেশদ্বার কি?

৬. ২০১৪ সালে আরাফার খুৎবার খত্বীবের নাম কি?

৭. ‘মু‘তাযিলা’ মতবাদের উদ্ভাবকের নাম কি?

৮. খিযির কি নবী ছিলেন?

৯. ‘দ্বীনে ইলাহী’ কতসালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

১০. ‘ইন্টারপোল’ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

১১. সংবাদপত্র কি?

১২. ২০১৪ সালের আরাফার দিন কি বার ছিল?

১৩. বেলায়েত আলীর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কতিট?

১৪. একটি অন্তরে কয়টি জিনিস একত্রিত থাকতে পারে না এবং তা কি কি?

১৫. সোনামণি সংগঠন কোন সূরার কত নং আয়াতের আলোকে গঠিত হয়েছে?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. আনুগত্য ২. কর্মীরা ৩. ইখলাছ ৪. পাঁচটি ৫. ৪টি ৬. ৪৪তম ৭. ১৮৯০ ৮. ১১ লাখ হেক্টর ৯. মাওলানা বেলায়েত আলী ১০. ৪টি ১১. ইসহাক ভাট্টি ১২. কে-টু ১৩. ১৮৪৮ ১৪. ৪০ জন ১৫. ১৯৭৩

কুইজ ১/৮ (২) :

১. আদম থেকে নূহ (আঃ) পর্যন্ত ব্যবধান কত ছিল

২. নূহ (আঃ)-এর বয়স কত বছর?

৩. পৃথিবীতে মোট কয়টি জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে?

৪. আবুল বাশার ছানী’ কাকে বলা হয়?

৫. নূহ (আঃ)-এর কয়জন পুত্র ঈমান আনেন?

৬. আরবের পিতার নাম কি?

৭. রোমকদের পিতার নাম কি?

৮. ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশে কতজন নবী এসেছেন এবং নাম কি?

৯. নূহ (আঃ) কোন সম্প্রদায়ের নিকট অবতীর্ণ হন?

১০. নূহ (আঃ) সম্পর্কে কুরআনের কয়টি সূরায় কতটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে?

১১. ‘অদ’ কোন বংশের মর্যাদার পাত্র ছিল?

১২. পৃথিবীর প্রাচীনতম শির কি?

১৩. নূহ (আঃ)-এর কয়টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল?

১৪. নূহ (আঃ) মোট কয় পুরুষ দাওয়াতি কাজ করেন?

১৫. ‘চুলাকে আরবীতে কি বলা হয়?

গত সংখ্যার কুইজের উত্তর : ১. আদম ২. আদম ৩. না ৪. চার্লস ডারউইন; ঊনবিংশ শতাব্দিতে ৫. আদম ৬. আদমের পাজর হতে ৭. নগ্নতা ৮. তাওহীদের ৯. আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠা করা ১০. তীন ফল।

বর্ণের খেলা ৩/৮ :

নির্দেশনা :

বৃত্তের প্রতিটি অংশে একটি করে অর্থবোধক শব্দ দেয়া আছে। তবে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই একটি কিংবা দুটি অক্ষর খুঁজে পাবেন না। এ বর্ণগুলো বের করে পুনর্বিন্যাস করলে একটি সংগঠনের নাম জানা যাবে।

১.....

২.....

৩.....

৪.....

অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকা নাম.....

সংখ্যা প্রতিযোগ ৪/৮:

নির্দেশনা :

খোপের নিচে দেওয়া চারটি সংখ্যা প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম খোপে বসবে। এবার দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ খোপে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলো এমনভাবে বসান, যাতে উত্তরটি অবশ্যই সমান চিহ্নের ডান পাশে দেওয়া সংখ্যাটির সমান হয়। চারটি সংখ্যা একবারই ব্যবহার করতে পারবেন। তবে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ চিহ্নগুলোর মধ্যে কোনটি একাধিকবারও ব্যবহার করা যেতে পারে।

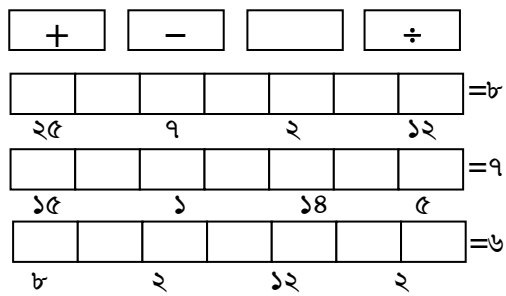

*[**উত্তর পাঠানোর ঠিকানা** : বিভাগীয় সম্পাদক, আই কিউ, তাওহীদের ডাক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩৮-০২৮৬৯২]*